জীলানী. জান শরীফ

বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

আধ্যাত্মিক প্রদীপ্ত

প্রকাশক : দরবার শরীফ

পক্ষে মোঃ আক্তারুজ্জামান (বাবু)

মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৫১০০৫৯

স্বত্ব : মুক্ত

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২০ইং

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০ইং

প্রচ্ছদ : সুজন

বর্ণবিন্যাস : সুজন

মুদ্রণ : মমিন অফসেট প্রেস, রাজা হাজী মার্কেট, পাবনা।

মূল্য : ১৬০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

জীলানী. জান শরীফ

বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।

Web: www.babadeloyer.com

YouTube Baba Deloyer

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

মুর্শিদে ত্বরিকত সাইয়্যেদ শাহ সুফি কামাল নূরী আল-সুরেশ্বরীর পবিত্র হস্ত মোবারকে বইটি উৎসর্গ করিলাম। যিনি বর্তমান গদ্দিনশীন মোর্শেদ কেবলা ও প্রধান মোতাওয়ালী সুরেশ্বর দরবার শরীফ, নড়িয়া, শরীয়তপুর। উনার সান্নিধ্যে খুব একটা থাকার ভাগ্য হয় নি তবে অত্যান্ত বিচক্ষণ এবং ধৈর্যশীলতার পরিচায়ক। তবে উনার দুই শাহজাদার সান্নিধ্যে অধম কিছুটা সময় নিয়োজিত ছিল। পীরজাদা সাইয়্যেদ শাহ সুফি দীদার নূরী সুরেশ্বরী (বড় শাহজাদা) এবং পীরজাদা সাইয়্যেদ শাহ নূরে হাসান দিপু নূরী সুরেশ্বরী। উভয়ই সুরেশ্বরীর আওলাদ হবার পরেও বিনয় ভালবাসা অধম গোলামেরও গোলামকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে।

এত উঁচু বংশের সান্নিধ্যে স্মৃতিটুকো ধরে রাখতে আমার মত অজ্ঞানীর এই নিবেদন পুস্তকটি মুর্শিদে ত্বরিকত সাইয়্যেদ শাহ সুফি কামাল নূরী সুরেশ্বরী হুজুর কেবলার পবিত্র হস্ত মোবারকে উৎসর্গ করে গেলাম।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোন দামে বিক্রিত অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবে না। কারণ এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোন দেশের জাতী সত্ত্বার অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোন সাময়িকীতে এই বই এর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোন কারো নামে ধারাবাহিক ভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোন দিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। আরো উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাইতে পরিবেন।

আলোচ্য বিষয়গুলো যে ভাবে সাজানো হয়েছে ঃ-

(আলোচনার বিষয় সমূহ) (পৃষ্ঠা নং)

১। লেখকের কিছু কথা ৬

২। পবিত্র কোরানুল মজিদের সূরা ইয়াসিনের ৬টি আয়াতের ভাবার্থ ১৪

৩। কোরান সম্পর্কে কিছু কথা ৪৬

৪। কোরানের নাম নিয়ে কিছু কথা ৫১

৫। লকব ৫৫

৬। সিরাজাম মুনিরা ৫৮

৭। মেরাজ ৬৩

৮। স্রষ্টার প্রতিনিধিগণের কিছু মোজেজা ও কারামত ৭৪

৯। মোরাকাবা মোশাহেদা ১০১

১০। বাণী চিরন্তনী ১০৭

بسم الله الرحمن الرحيم

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

লেখকের কিছু কথা

বইটি লিখতে গিয়ে অনেক নতুন বিষয় সামনে উঠে এসেছে যা আমার জানা নেই। তাই আমার মহান মোর্শেদসহ অনেক আউলিয়াগণের কিতাব হতে সহায়তা নিতে হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হুবহু কিছু বাক্যও তুলে ধরেছি। (সাঃ) (আঃ) এই লেখাটা পড়তে হবে "সাল্লাললাহু আলাইহেস সালাতু সালাম" কারণ কোরান বলেছে, (সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার ১৫৪) :- "এবং তোমরা বলিও না, যাহারা নিহত হয় আল্লাহ্‌র পথের মধ্যে তাহারা মৃত, বরং তাহারা জীবিত, কিন্তু তোমরা জানো না"। বইটিতে একই কথা বার বার উঠে এসেছে এটা হয়ত অজ্ঞতারই চিহ্ন, তবুও লিখতে হচ্ছে। সাধকদের রীতি-নীতি ভাববাদী বিষয়ে নিহিত ধর্মের একটি মুক্ততার অবয়ব, মানুষ স্বাধীন ভাবে তার ধর্ম কার্য করবে। যে সকল বিষয় জাগতিক ভাবে প্রচলিত নেই সে আলোকে কিছু কথা বা চিহ্নিত বিষয়টি জ্ঞানীদের জন্য উপস্থাপন করে রাখা, যা হয়ত পৃথিবীর জ্ঞানীগণ একদিন এর সুন্দর গ্রহনযোগ্য মানদন্ড মানুষের কাছে পৌঁছে দিবে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহর শেষ হতে না হতেই মানুষের কাছে ধর্মীয় উদাসীনতা, ধর্মের ব্যাপক দলাদলির প্রবৃদ্ধি ধর্মকে ব্যবহার করে আমিত্বের বড়াই পথভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে নিয়ে চলেছে। এর অর্থ হলো খোলসের আবরণে ঢাকা বিষয়গুলো আধুনিক জ্ঞান বিকাশের ধারায় উন্মুক্ত হতে চলেছে। ধর্মে নির্বান প্রাপ্ত হয়ে মহান রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি জ্ঞাপন পূর্বক শিখা অনির্বান প্রজ্জ্বলন ঘটানোর চাইতে রাষ্ট্রীয় ভোগ বিলাসে (উমাইয়া-আব্বাসী) নীতিতে ধর্ম ব্যবহারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ, মোহ, হিংসা, বিদ্দেশ, চাটুকারীতার করাল গ্রাসে আবদ্ধ হয়ে চলেছে। রাসুল (সাঃ) (আঃ) এবং তাঁর-

বংশ ধর ও অন্যান্য মহা পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব গোপন রাখার চেষ্টায় লিপ্ত। এ অবস্থা থেকে মানুষকে প্রকৃত সত্য উপস্থাপনের জন্য সুফিরা কিছুটা লিখনির চেষ্টা শুরু করেছে। এ কারণেই সমস্যা বেশি তৈরী হতে চলেছে। সত্যের নূরময় পরিস্ফুটন সকল মিথ্যার আবরণকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রজ্জ্বলন শিখায় মানুষকে জানান দিতে সচেষ্ট হবে।

মোহাম্মদী ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবার যে শিক্ষা এবং কার্যাবলী তা এখন রূপান্তর (প্রায়)। আদর্শিক ভাববাদী ধারায় স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের পথে অগ্রযাত্রা প্রচলিত ভাবধারার অন্তরায় হিসাবে কাজ করে। রাসুল (সাঃ) (আঃ) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত আহলে বায়াতের ধারা অনুযায়ী নিজেকে সমর্পন, ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার সঠিক ভাবধারা তুলেধরা এবং রেবা কর্তৃক বর্জনীয় আদর্শই পারে প্রকৃত ধর্মের অন্তঃনিহিত মূল ধারায় পৌঁছাতে সহায়তা করতে। রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- "কিয়ামত কাল পর্যন্ত একটি দল আমার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে"। জ্ঞান প্রজ্ঞা দ্বারা উক্ত দলভূক্ত হিসাবে নিজেকে তৈরী করাই বর্তমান বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রকে সবার সমান বন্টন নীতির যে শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে তা উল্লেখ করলে এবং বর্তমান ব্যবস্থার সাথে তুলনা করলে ইহা পাগলের প্রলাপ বৈকি আর কিছু নয়। কারণ হলো; রিপু তাড়িত চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তী মানুষ আকৃষ্টের ধারাতে আকর্ষিত হয়। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসন হতে চায় না।

রেবা (সুদ) কি ?

রেবার আভিধানিক অর্থ হলো সুদ, বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি , অধিক্য, অতিরিক্ত, বেশি, পরিবর্তন, স্ফীত, বিকাশ, বিক্রয়লব্ধ, লভ্যাংশ ইত্যাদি (ইংরেজীতে, ইন্টারেস্ট, ইউজারী, এক্সসেস, এডিশন, গেইন ইন সেলিং)। অর্থনীতির পরিভাষায় সুদ হলো অর্থ বা সম্পদ ধার নেয়ার জন্য প্রদানকৃত "ভাড়া"। জাগতিক ভাবে বলা হয় হলো:- কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ ধার বা ঋন দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহন করাকে রেবা বা সুদ বলে। এই নিয়োগকৃত অর্থ কম বা বেশী হইতে পারে কিন্তু সবই সুদ বা রেবা হিসাবে জাগতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোরান যেহেতু ঐশী কিতাব এজন্য আধ্যাত্মিক ভাবে এই রেবাকে একটি সীমাবদ্ধ গন্ডী বা কম বেশি সমিচীন মনে করা সঠিক বলে প্রতিয়মান হয় না। এজন্য বলা হয় ইহার ব্যাপক অর্থবহ অবস্থা হলো মানুষিক হাল বা অবস্থা-

যা প্রয়োজনের চাইতে বা অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করাটাই রেবা। আগমনকারী ধর্ম রাশীতে সঞ্চয় ব্যয় না করিয়া মনের কোটায় মোহ রূপে থাকলে তা রেবা রূপে চিহ্নিত। কোরানুল মাজিদে সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার ২৭৫ ও ২৭৬:- "যাহারা খায় সুদ তাহারা দাঁড়ায় না একমাত্র যেমন দাঁড়ায় যে, তাহাকে পাগল বানাইয়া দিয়াছে শয়তানের স্পর্শ হইতে। ঐটা নিশ্চয়ই তাহারা বলে, নিশ্চয়ই কেনা-বেচার মতই সুদ। এবং হালাল করিয়াছেন আল্লাহ্ কেনাবেচাকে এবং হারাম করিয়াছে সুদকে। সুতরাং যাহার কাছে আসিয়াছে তাহার রব হইতে উপদেশ। সুতরাং সে বিরত রহিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য যাহা অতীত হইয়াছে, এবং তাহার হুকুম আল্লাহ্র দিকে। এবং যে ফিরিয়া আসিল, সুতরাং উহারা আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহার মধ্যে অনেক দিন থাকিবে"। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৬) :- "আল্লাহ্ ভালবাসেনা প্রত্যেক রেবাকারী, অকৃজ্ঞ পাপীকে"।

এ প্রসঙ্গে মহানবীর চাচাত ভাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনে যেঃ- যারা সুদ খায় তারা কেয়ামতের দিন (মরণের সময়) উদ্ভ্রান্ত এবং পাগলের মত হয়ে উঠে। রেবা সমাজ ও বিশ্বে সর্বদলীয় কোন্দলের মূল উৎস হিংসা এবং ঘৃণা রেবা হতে তৈরী হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ অসাম্য সৃষ্টি করিয়া সমাজে শত প্রকার ঝগড়া-বিবাদ রচনা করিয়া মানব সমাজে অশান্তির মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাহারা রেবা খায় তাহাদের সম্পর্কে কোরান বর্ণনা করেন, তাহারা জীবনের যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকে তাহা শয়তানের স্পর্শ প্রাপ্ত। ভূত গ্রস্থ পাগল ব্যক্তির মত ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহারা ধনের নেশায় আপন রব হইতে দূরে থাকে। এরা সুখিও নয় এবং সুখ দানে অক্ষম। এই জাতীয় লোক সমাজে রেবার ভাব সঙ্গে লইয়া আজীবন অযৌক্তিক ব্যবস্থা জারী করে থাকে।

আপন রবের সঙ্গে সংযোগ না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মধ্যে রেবার মত্ততা থেকে যায়। অতএব রেবা সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করিয়া সমাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তি তাহারাই হইতে পারেন, যাহারা আপন রবের সংযোগ অবিরাম ভাবে সু-প্রতিষ্টিত করতে পেরেছেন। অর্থাৎ রেবা হইতে যিনি বিরত হইয়াছেন তাহার মোহ কালিমা অতীত হইয়া গিয়াছে এবং তিঁনি পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছেন। রেবা যাহারা ভোগ করে এরূপ চঞ্চল মতি লোকেরা সকলেই আগুনের অধিবাসী। আল্লাহ্ রেবা ধ্বংস করেন। অর্থাৎ রেবার উপর ভিত্তি করা মানব জীবন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী চির ধ্বংসশীল। রেবা ত্যাগ না করা পর্যন্ত মানুষ জাহান্নাম হইতে উত্তরিত হইতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে মন হইতে রেবা ত্যাগ করিলে সমাজে আর্থিক দান যেমন বর্ধিত হয় তেমন সত্যকে প্রত্যক্ষ করার শক্তিও বৃদ্ধি পায়। রেবার পক্ষপাতী লোকেরা অবশ্যই সত্যে অবিশ্বাসী পাপী। তাই এই সকল অবিশ্বাসী পাপীকে আল্লাহ্ ভাল বাসেনা। রেবা ত্যাগ না করিলে কুফুরী হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। অপর পক্ষে পাপী যখন ধর্মের সঠিক নিয়ম মেনে অনুশীলন করে তখন পাপের মোহ বন্ধন হতে ক্রমশ ধীরে ধীরে মুক্তিমুখী হইতে থাকে। সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার ২৭৯,২৮০:- সুতরাং যদি তোমরা না কর (রেবার শর্ত ছাড়িয়া না দাও) সুতরাং তোমরা জানিয়া রাখ আল্লাহ্ এবং তাহার রাসুল হইতে একটি যুদ্ধের (ঘোষণা) এবং যদি তোমরা তওবা কর সুতরাং তোমাদের জন্য তোমাদের মালের মূলধন। তোমরা জুলুম করিও না এবং জুলুম করা হইবে না (তোমাদের উপর)। "২৮০" এবং যদি অভাবওয়ালা হয় সুতরাং অবকাশ দাও স্বাচ্ছন্দের দিকে এবং যদি তোমরা সদকা কর তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে"। রেবা সম্পর্কে অত্যান্ত সুক্ষ্ম গভীর মাধুর্যময় তাৎপর্যপূর্ণ লিখনিতেও ফুটিয়ে তুলেছেন দাদাজান শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) তাঁর লিখিত কিতাব "কোরান দর্শন" নামক বইটি পড়বার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল। তৎসঙ্গে আয়াতে কারিমাগুলো পাঠকদের অনুধাবনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সাথে আমার মহান মোর্শেদ কেবলা-কাবা ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরীর "মারেফতের গোপন কথা" বইটি পড়বার জন্য বিনিত অনুরোধ করি। এই বইটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ধন-সম্পদ বা পুজীবাদী ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সুন্দর আলোচনা করে হয়েছে।

প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা একবার ভাবুন তো দুনিয়ার জিন্দিগির কোন অবস্থানে আজ আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি দন্ডায়মাণ ? নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করলে এর সদ উত্তর মিলবে। এ যেন গাছের গোঁড়া কেঁটে আগায় পানি ঢালার মতই সৌন্দর্য বর্ধক ব্যতীত আর কিছু নয়। মানুষের মনোরাজ্যে প্রতি মুহূর্তে যে কত প্রকার চিন্তা চেতনা এবং কথার অবতারণা হয় তা থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া রেবা ত্যাগ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। মহিয়ান, গরিয়ান, সুমহান, সুপ্রভ, সুপ্রসন্ন নীতির মূল ধারায় আল্লাহ্পাক কালে-কালে তাঁরই (আল্লাহ্র) প্রতিনিধির দ্বারা মূলের বিধান মানুষের কাছে পৌঁছাইয়াছেন। অনেকেই আমাকে বলেছেন, বাবা জগত সংসারের চাহিদা মেটানোর তাগিদে "সুদ" ব্যতীত অসম্ভব আর আপনি বলেন মনের প্রবৃদ্ধি থেকে সরানো এসব পান কই ?

ধর্ম আমরা পালন করে ৭০ বছরের জিন্দিগি পার করলাম, এমন নতুন নতুন বিষয়তো শুনিনি। "আমি বললাম" বাবা এটা তো কোরানেরই কথা। আবার বলে উঠে "কোরান কি আপনিই পড়েন ?" চিত্তির বিস্ময় বুকে নিয়ে চুপ হয়ে গেলাম। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলে ছিলেন, কম্বলের হুল বা সুতা বাছাই করলে থাকে কি ! তাই প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান কারীর জন্য হয়ত উল্লেখিত বিষয়গুলো সহায়ক হিসাবে কিছুটা হলেও পথের দিশা দেখাবে।

আলোচ্য বইটিতে সব চাইতে বেশি আলোচনার তাৎপর্য এবং গুরুত্ব পেয়েছে সূরা ইয়াসিনের প্রথম হতে পঞ্চম আয়ত-এ উল্লেখিত রহস্য ভান্ডারের বা গুপ্ত লকবগুলি সহজ সাধ্য করে বুঝানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। যেন মানুষ তাদের স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বিকাশের ধারাতে ধর্ম ধারণ বা আয়ত্ত্ব করতে শেখে। এই রহস্যময় ধারাগুলির পঞ্চম আয়াতে রহিম রূপে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। যারা মনে করে আল্লাহ্ তো আল্লাহ্, কিন্তু কথা হলো এত নাম এবং গুণের পৃথক ধারার কার্যাবলীর কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে আধ্যাত্মিকতার আলোকে পাঠকের জন্য সহজ সাধ্য ভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে এসেছে "মুস্তাকিম" এটাকে সহজ সাধ্য হিসাবে তুলে ধরতে বিভিন্ন উদাহরণ সম্বলিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেন পাঠকগণ সহজেই তা বোধগম্য করতে সচেষ্ট হয়। তৃতীয় আয়াতে এসছে "মুরসালিন" হায়াতে বা জীবদ্দশায় মানুষ যে অলৌকিক রূপ বৈচিত্র দেখতে পায় তারই আলোকে বিষয়টি বুঝতে একটু গভীর মনোযোগের সহিত আধ্যাত্মিকতার আলোকে তুলো ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এসেছে "কোরানুল হাকিম"। পবিত্র কোরান যে একটি বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ সেই আলোচনাটুকু বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ্পাক তাঁর কালাম বিজ্ঞানেরও অনেক উপরে সে কথাগুলো ভাববাদ বা আধ্যাত্মিকতার আলোকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিষয়গুলো মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে পাঠকগণ যেন সহজে অনুমেয় হয় তারই চেষ্টা করা হয়েছে। আর প্রথমত "ইয়াসিন" বিষয়টা বিস্ময়কর একটি লকব বা হরফ, এ প্রসঙ্গে একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কারণ হলো পূর্ববর্তী চারটি ধাপ বা যোগ্যতার উপরে এই মানদন্ড এ বিষয়গুলোকে মুক্তমনা চিন্তাশীল পাঠককুল হয়ত অনেক উপকার পাবে। তৎসঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে বিশেষ ধ্যান-ধারণা কাজে লাগিয়ে হয়ত আরও সুন্দর ও মাধুর্যময় লেখা জ্ঞানীগণ মানুষের জন্য উপস্থাপন করবে। যা কর্ম পন্থায় বিশেষ সহায়ক হিসাবে ভূমিকা রাখবে। পাঠের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির বোধদয় হতে সুক্ষ্ম চিন্তা চেতনার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান হাসিল পূর্বক দর্শন ভিত্তিক ব্যবস্থার দিকে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করবে। দুনিয়া বাসীর জন্য দর্শন ভিত্তিক ধর্মীয় বিধান জরুরী। কারণ হলো ধর্মীয় এত বিতর্কের অবসানে আধ্যাত্মিক নীতির আলোকে স্বীয় ধর্মকে কার্যকর এবং উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য কিছুটা হলেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। মহিয়ান, গরিয়ান, সুমহান স্রষ্টা আমাদেরকে তাঁর প্রকৃত বিধান আয়ত্ত্বের মাধ্যমে মূল ধারার দিকে যেতে সহায় হবেন। তৎসঙ্গে প্রচলিত ভাবধারার বল পূর্বক পাঠের আয়ত্ত্বকৃত ব্যবস্থার বন্ধন থেকে উত্তরিত হয়ে মাবুদের সাক্ষাৎ লাভের দিকে অগ্রযাত্রায় সামিল হলে এই লেখনিটুকো স্বার্থকতা পাবে।

হাজা হাবিবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্লাহ শাহান শাহে ওলি আফতাবে ওলি সুলতানুল হিন্দ হিন্দাল ওলি আতায়ে রাসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ শেখ সৈয়দ মাওলানা মঈনউদ্দিন হাসান সানজারী আল-হুসায়েনী ওয়াল-হাসানী (আঃ) বর্ণনা করেছেনঃ- "শা হাস্তে হুসায়েন, বাদশা হাস্তে হুসায়েন, দ্বীন হাস্তে হুসায়েন, দ্বীনে পানা হাস্তে হুসায়েন, সারদাদ নাদাদ দাস্ত দার দাস্তে ইয়াজিদ, হাক্কাকে বেনায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাস্তে হুসায়েন"। অর্থঃ- হুসায়েন হলো ধর্মের সম্রাট, এবং দুনিয়ার সম্রাট (ঐশী যোগ্যতা প্রাপ্ত), হুসায়েন হলো ধর্ম এবং ধর্মের আশ্রয়দাতা হুসায়েন, দিলেন মাথা না দিলেন হাত ইয়াজিদের হাতে (জীবন দিলেন সন্ধি না করলেন ইয়াজিদের সাথে), সত্য ইহাই যে (লা-ইলাহা ইল্লালাহু) এর স্তম্ভ হইল হুসায়েন (আঃ) সকল নামের সাথে যুক্ত হবে। এই আদর্শ হলো প্রকৃত বিধান। সুতরাং উক্ত আদর্শের উপর স্বীয় ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণ-পণ চেষ্টা করে যেতে হবে, এটাই প্রত্যাশা।

অতঃপর কোরান সাত হরফে নাজেল বিষয়ে কিছু তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করা হয়েছে যা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়কে সমন্বয় সাধন কল্পে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ বিষয় সম্পর্কে চলমান দুনিয়াতে কম সংখ্যক মানুষ জ্ঞাত -

রয়েছে। তৎসংলগ্ন বিষটির সঙ্গে সামান্য কিছু "১৯" সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে যা জ্ঞানীগণের দৃষ্টিতে একদিন হয়ত এর বিশদ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপনার লেখনি জাতিকে জানান দিতে সচেষ্ট হবে। অতঃপর কোরানুল মাজিদের নাম সমূহ অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে। যা বর্তমান সময় পর্যন্ত কোরানুল মাজিদের বিভিন্নতার সৌন্দর্যময় অবস্থান।

অতঃপর "লকব" বিষয়ে বাস্তবিক কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে, যা দ্বারা অনেক ফেতনার অবসান হবে। এ বিষয়ে একটু উল্লেখ রাখতে চাই, আর তা হলো আমার নামের শেষে সুরেশ্বরী লাগানো এটা একটি "লকব"। কেউ চিশতীয়া, কাদরিয়া, হাসিমী, নকশাবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, ওয়াইসিয়া ইত্যাদি "লকব" চলামান দুনিয়াতে প্রচারতব্য তরিকতের বিন্যাস। উক্ত ধারা সহজ ভাবে উপলব্ধির জন্য খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে পুস্তকটিতে। অতঃপর রহস্য জগতের আর এক নাম "সিরাজাম মুনিরা" বিষয় সম্পর্কে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক মত উপস্থাপন পূর্বক উক্ত ধারার নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর আলোকে বন্ধন সমূহ নিপতিত করবার লক্ষে যুক্তিযুক্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে বিষয়টি রহস্যময় বটে।

অতঃপর মেরাজ সম্পর্কে চলমান দুনিয়াতে প্রচার তব্য বিষয় যা লোক মুখে হর হামেশা শোনা যায়, এটাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সাধকের চিন্তা-চেতনার বিষয় সহ কিছু দালিলিক প্রমাণ এবং কিছু মত সহ সুন্দর সাবলীল ভাবে এবং সহজ সাধ্যে বুঝবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। মেরাজ সম্পর্কিত চলমান সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত মত যা দলিল খুঁজে পাওয়া বিরল এমন কথাও ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রকাশ করে যেমন :- হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর সিনাছাক ৩ বার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এরকম বহু কথার সমারোহ ধর্মের আলোকে চলমান ধর্মীয় নীতিতে প্রচলিত। তাই উভয় মতকে (জাগতিক/আধ্যাত্মিক) উপস্থাপন প্রক্রিয়াতে লেখনিটুকো দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, যেন পাঠক বাবা-মায়েদের সহজে অনুমেয় হয়।

অতঃপর মোজেজা বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। মোজেজা বিষয়টি যেহেতু অলৌকিক তাই এ বিষয়ে কত রকমের যে গাঁজাখুরী গল্পের প্রচলন রয়েছে তা মাবুদ'ই ভাল জানেন। তবে বিজ্ঞ পাঠকদের জন্য মূল ধারার কথাগুলো উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এমনও অনেক মতে রাসুলগণের অলৌকিক -

ক্ষমতাকে মোজেজা বলে আর ওলিদের কার্যকে কারামত বলে। মোজেজা ও কারামত পৃথকীকরণ ব্যতীত একই ভাবধারাতে পুস্তকটিতে আলোচনা রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠক বাবা-মায়েরা কিছু নতুন বিষয় যা পূর্বে জানতে পারেনি এমন ধর্মীয় আলোচনা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন। সুন্দরের প্রত্যাশায় পরিবর্ধন পরিমার্জন সামনে রেখে উপস্থাপন করা হইল।

অতঃপর মোরাকাবা-মোশাহেদা সম্পর্কে - মূলধারার বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে যা দ্বারা পাঠক বাবা-মায়েরা ধর্মের মূল বিষয় সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে মানুষ প্রকৃত বিধান অবলম্বনে তার স্বীয় ধর্মে কর্মে সুফল প্রাপ্তির ধারাতে অগ্রগামী হতে সচেষ্ট হবে। উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে অনেক মানুষেরই ধ্যান ধারণা না থাকায় বিরূপ চিন্তা চেতনায় লিপ্ত হবার অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই আমল নীতির দিকে মনোনিবেশ করলে অবশ্যই সুফল ঘটবে (ইনশাআল্লাহ্)।

তুলনামূলক মত সহ প্রকৃত বিষয় অনুধাবন করতে পাঠক বাবা-মায়েরা সচেষ্ট হবে বলে আশা রাখি। পরিশেষে আল্লামা ইকবালের সেই মহান বাণী দিয়ে শেষ করব :-

“মুসলিম! সেতো কবে মরে গেছে

ইসলাম লেখা কেতাবে।

আকিদা আমল সবই চলে গেছে

মুসলিম আজ খেতাবে।

অন্তরে তাদের বাসা বাঁধিয়াছে

শুধু লাত-মানাতের দল,

মুশরিক আজ মুসলিম বেশে

করিতেছে কোলাহল”

পবিত্র কোরানুল মাজিদের সূরা ইয়াসিনের ৬টি আয়াতের ভাবার্থঃ-

বিস্‌মিল্লাহির্ রহ্‌মানির রহিম।

অর্থঃ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু, (আর-রহ্‌মান) যিনি দয়াল দাতা এবং (আর-রহিম) যিনি দয়ালু।

১) ইয়াসিন।

অর্থঃ- হে প্রদীপ্ত প্রদীপ।

২) ওয়াল্ কুরআনুল্ হাকিম্।

অর্থঃ- সাক্ষী এই বিজ্ঞানময় কোরানের।

৩) ইন্‌না কালা মিনাল্ মুর্‌ছালিন্।

অর্থঃ- আপনি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) (আঃ)} রাসুলগণের মধ্য হইতে।

৪) আলা সিরাতিম মুস্তাকিম্।

অর্থঃ- আমাদেরকে মুস্তাকিমের (সত্য/সঠিক) পথে পরিচালনা করুন।

৫) তান্‌জিলাল্ আজিজুর রহিম।

অর্থঃ- ইহা প্রবল ক্ষমতাবান রহিম হইতে নাজেল।

৬) লিতুন্‌জিরা কাওয়াম্ মা উন্‌জিরা আবায়ুহুম্ ফাহুম্ গাফিলুন্।

অর্থঃ- তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে এই হেদায়েতের বাণী পৌঁছানো হয়েছিল কিন্তু তারা গাফেল।

ইয়াসিন

পবিত্র কোরানুল মাজিদের ১১৪টি সূরার মধ্যে ২৯টি সূরার প্রারম্ভে হরফ মদযুক্ত আয়াত রয়েছে। উক্ত আয়াতে কারিমাকে মোকাত্তাআতে্র হরফ যুক্ত আয়াত বা শুধু মোকাত্তাআতে্র আয়াতও বলে।

আয়াতে কারিমার শুরুতেই বলা হলো ইয়াসিন। অনেকেই মোকাত্তাআত্ এর হরফ যা আছে এর অর্থ তাই লিখে থাকেন তার আলোকে অর্থ দাঁড়ায় ইয়াসিন। কিন্তু ভাববাদী গবেষকদের অনুবাদ এবং তাফসির দেখলে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়। তাই ভাববাদীতে লেখনিটুকু এর ভাবার্থসহ ভাববাদী উপস্থাপনের চেষ্টা বা আলোচনার চেষ্টা থাকল।

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে "ইয়া-সিন" এর অর্থ "ইয়া ইনসানো" অর্থাৎ হে মানব বা হে মহামানব। ইয়াসিন নামটি মহান আল্লাহ্পাকের নিকট একটি প্রিয় নাম বা লকব। হযরত শাহ সুফি সদরউদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) এই ইয়াসিন মোকাত্তাআত্ বা শব্দের অর্থ করেছেন হলঃ- হে প্রদীপ্ত প্রদীপ। অনেকের মতে "ইয়া-সিন" প্রতীক দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) কে সম্বোধন করা হয়েছে। নূর মোহাম্মদ মানুষ মোহাম্মদের রব, এই হিসাবে সূরাটির সূচনা হয়েছে। "সিন" অক্ষরটি "সামস্" এবং "সিরাজাম মনিরা" শব্দদ্বয়ের প্রতীক। "সামস্" অর্থ সূর্য। ইহা রাসুলের (সাঃ) (আঃ) একটি খেতাব এবং "সিরাজাম মনিরা" অর্থ আলোকিত প্রদীপ। তাই "সিন" অক্ষর দ্বারা রাসুলের (সাঃ) (আঃ) গুণবাচক খেতাবী নামরূপেরই উল্লেখ। উক্ত আলোচনার আলোকে ইয়াসিন শব্দের অর্থঃ- হে প্রদীপ্ত প্রদীপ। এটা এমন ধরনের প্রদীপ যা সেই প্রদীপেরও প্রদীপ। যার ভিতরে প্রজ্জ্বলনকৃত একটি ধারার ধারাবাহিক প্রজ্জ্বলন ঘটেছে, সেই প্রজ্জ্বলনকৃত ব্যবস্থায় হলো একটি প্রদীপ্ত ব্যবস্থা। শুরুতেই বলা হলো :- হে প্রদীপ্ত প্রদীপ। প্রদীপ্ত বলতে আমরা একটি নূরময় ব্যবস্থাকেই জেনে থাকি। সমগ্র কোরানুল মাজিদের মধ্যে মূল্যবান এবং ভাবার্থের দিক থেকে বিন্যাসকৃত আমল নীতিতে সূরা ইয়াসিনকে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাবান আসন দান করা হয়েছে। সাধকগণ বলেছেন সমগ্র কোরানুল মাজিদের একটি বিস্ময়কর যে ব্যবস্থাপত্র সেটাই হলো "ইয়াসিন" অর্থাৎ নূরময় বা আলোকিত ব্যবস্থা।

আমরা ধারণা করি যে, একটি মানব জন্ম লাভের পর থেকে তার আলোকিত সত্ত্বাকে ধীরে ধীরে জাগরণ ঘটাবে। সেই জাগরণকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তার উন্নত স্তর হবে, সেই স্তর ভেদ করে যেতে যেতে সে এমন একটি চূড়ায় বা আসনে অধিষ্ঠিত হবে, যে আসনটি প্রজ্জ্বলিত ধারা। এটাকে যদিও প্রদীপ বলা হয়েছে, নূরময় একটি ধারা থেকে সে সৃজন হবে যা নূরময় অবয়ব।

যখন জাগতিক কোন উদাহরণ উপস্থাপন করা হয় যেমন:- গুরুত্বপূর্ণ বা বিশেষ কোন ব্যবস্থাকে আমরা সোনা বা রূপার তৈরী কাঠামো দ্বারা নির্মাণ শৈলীতে আবদ্ধ করি, সেই আবদ্ধকৃত ব্যবস্থা হলো একটি ঢাকনার আবরণ। তার ভিতর সেই মূল্যবান বস্তু রাখা হয়। ধরে নিলাম, একটি কোহিনূর পাথরকেই আবরণকৃত শৈলীতে রেখে দেই। এর অর্থ হলো এই সুন্দর আবরণকৃত ব্যবস্থার মধ্যেও আরও সৌন্দর্যময় কোন ব্যবস্থা রয়েছে। ঠিক প্রদীপ্তের প্রদীপ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, স্রষ্টা থেকে যা আবির্ভাব হয়েছে সেটাকে প্রদীপ আকারে সন্নিবেশিত করবার পরে সেটা আবার স্রষ্টার সমাসীনকৃত ব্যবস্থায় লীন হয়ে তার চেয়েও বৃহত্তম কোন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকলে, যা জাগতিক ভাবে ভাষার শৈলীতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঠিক সে রকম মানদন্ড "ইয়াসিন" সেই রূপ ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একটি হরফ দ্বারা। সেই হরফের প্রারম্ভেই ইয়া (হরফ) সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইয়া শব্দের অর্থ দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সম্মান সূচক ব্যবস্থা বুঝে থাকি। অর্থাৎ সমগ্র কালামপাকের সকল অবয়বকে একটি সৌন্দর্যময় এবং পরিস্ফুটন মানদন্ডকে স্থীতিশীল বা দাঁড় করবার যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াতে সমাসীন হলে সেটা সম্মানিত হয়ে যায়। সেই সম্মাননা ভাষার শৈলীতে প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করবার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি তবুও পূর্ণতা প্রকাশ পায় নি। তাই মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর কালামপাকের মধ্যে মহান বাণী "ইয়াসিন" হরফ দ্বারা এটাকে সন্নিবেশিত ও সম্মানিত করেছেন। ইয়াসিন হরফ দ্বারা যে বিন্যাস করা হয়েছে এর ভাবার্থ, দিকনির্দেশনা, উপসংহার, কার্যকারিতা সকল কিছুরই সমন্বয়ে উক্ত হরফের (ইয়াসিন) মধ্যে নিহিত।

উদাহরণ স্বরূপঃ- জাগতিক ভাবে সাঁটলিপি সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা জেনে থাকবেন যে, একটি কথা বা বাক্যকে একটি চিহ্ন বা প্রতীক দ্বারা (সংক্ষেপে) লিপিবদ্ধ করা হয়। এই প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা ঐ শব্দ বা বাক্যকে বুঝিয়ে থাকে। ঠিক একই ভাবে মূল ধারার বিষয়বস্তু বা মহান স্রষ্টার যে মূল অভিধানের ক্রিয়াকলাপ বা নূরময় রূপক ব্যবস্থার যে সারমর্ম, সেই সারমর্মেরই মূল চালিকা শক্তির বহিঃপ্রকাশ এই "সিন" হরফ দ্বারা। যেমন :- খনি থেকে লোহা উত্তোলন, এরপর তা একটি নির্দিষ্ট মানদন্ডে ব্যবহারের উপযোগী করা এবং পরবর্তীতে সেটা দ্বারা বিভিন্ন নির্মাণ কাঠামো ও যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয় কিন্তু মূল হলো লোহা। তদ্রুপ "ইয়াসিন" লকব বা নাম। বিষয়টি আরও সুন্দর বুঝবার জন্য পরবর্তী আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্পাক সুস্পষ্ট ভাবধারাতে বর্ণানা করেছেন।

ভাববাদী ব্যবস্থায় যারা কোরানুল মাজিদের তাফসীর বা অনুবাদ করেন, সেই তাফসীর বা অনুবাদের আলোকে মোকাত্তাআতে্র হরফ অর্থ হলো এই অর্থ দ্বারা সমস্ত প্রজ্ঞা বা বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়। যেমন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) বলেছেন :- এই কোরান হইল সৃষ্টি রহস্য সম্বলিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং ইহা মানব জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি।

ইহার দর্শন প্রকাশের মৌলিক ভিত্তি ছয়টি :-

১. জন্মান্তরবাদ।

২. আধ্যাত্মবাদ বা সুফিবাদ।

৩. গুরুবাদ।

৪. দায়েমী সালাত। আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে শিরিক হইতে মুক্ত হইবার জন্য দায়েমী সালাত পালনের আহক্ষান।

৫. রূপক ভাষা। ব্যাপক ভাবে রূপক ভাষা ব্যবহার ইহার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। ইহাতে সাহিত্যক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাব-গাম্ভীর্য সৃষ্টি করিয়া সর্ব সাধারণের চিন্তা-চেতনা হইতে অর্থাৎ ইতর জনতা হইতে কৌশলের সহিত ইহার তথ্য ও তত্ত্ব দূরে রাখিয়া ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

৬. "মদ" নামক দুই প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থ বহন করে। দীর্ঘায়িত করিয়া পাঠ করিবার ইঙ্গিত ইহাতে বহন করে"। এই ছয়টি বিষয়ে কোরান প্রকাশের ভিত্তি রূপে গ্রহন করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার একটিও অস্বীকার করিলে কোরানের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে না।

হরফের বিন্যাসকৃত ব্যবস্থায় আমরা সাধারণত মোট ১৪ প্রকার সাংকেতিক (শব্দ) চিহ্ন বা মোকাত্তাআতের হরফ পেয়ে থাকি। এই ১৪টি সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক রাসুল (সাঃ) (আঃ) এবং তাঁর বংশের ১৪ মাসুমের প্রতীক রূপে গ্রহন করা হয়েছে। মোকাত্তাআত্ বা সাংকেতিক (শব্দ) চিহ্নগুলো মহাপুরুষদের গুণাবলীর উল্লেখ্য বা তাঁদের গুণাবলীর প্রতীক। সাংকেতিক অক্ষরের সাথে সংশ্লিষ্ট সূরার প্রারম্ভিক কথাগুলো কিরূপ সম্বন্ধ রয়েছে সেগুলো পাঠক বাবা-মায়েরা উক্ত আলোচনার আঙ্গিকে আপনাদের দেখবার জন্য মত প্রকাশ করছি। বিষয়টিকে সংক্ষেপ করবার জন্য বিস্তারিত লিখলাম না।

উদাহরণ স্বরূপ:- নিম্নে কিছু সূরার নাম পাঠকের জন্য উল্লেখ রইল।

সূরা বাকারা, সূরা ইউনূস, সূরা মোমিন, সূরা হা-মীম, সূরা শূরা, সূরা জোখ্রুফ, সূরা শুয়ারা, সূরা সোয়াদ, সূরা ক্বাফ, সূরা নুন (কালাম), সূরা তা'হা, সূরা নমল, সূরা ইয়াসিন, সূরা আরাফ, সূরা রা'দ, সূরা মরিয়ম ইত্যাদি। ঐ সকল সূরার মধ্য থেকে একটি বিন্যাস অর্থাৎ একটি সূরার প্রারম্ভ করবার সূচনাতে এই মোকাত্তাআতের হরফগুলো জারী করা হয়েছে। তাহলে এই হরফ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ? কারণ মানুষের জন্য কোরান নাজেল। তাই কোরানের সবকিছুই মানুষের জন্য জ্ঞাতব্য। আমি হয়তবা বেশির ভাগ বিষয়ে বুঝতে অক্ষম, তাই বলে সাংকেতিক চিহ্ন বা মোকাত্তাআতের অক্ষরগুলির ইঙ্গিত আল্লাহ্পাক ছাড়া আর কেউ জানবে না, একথা মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়। যেহেতু মানুষের জন্যই কোরান প্রেরিত হয়েছে, এজন্য কোরানে যা কিছু আছে সবকিছু মানুষের জানবার জন্যই নবী-রাসুলগণের উপর নাজেল হয়েছে।

কোন কোন হরফের উপরে চার আলিফের টান রয়েছে, আবার কোন কোন হরফের সমন্বয় সাধন অর্থাৎ যোগসূত্রের সাথে আবার চারআলিফের টান রয়েছে। তাহলে এই চার আলিফের টানকে আমরা পুঠিতব্য বিষয়ে উচ্চারণ করার সময় দীর্ঘ সময় টেনে আওয়াজ করে পড়ে থাকি। কিন্তু ভাববাদী যে -

ভাবার্থ সেটা হলো দীর্ঘ মেয়াদী অবারিত একটি বিষয় সম্পর্কে বোঝানোর জন্য এই টান বা চিহ্ন (চার আলিফ) ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নকে বলা হয় অবারিত বিন্যাসকৃত ব্যবস্থা। অর্থাৎ এটা সব সময় সমাসীন, কখনও বন্ধ বা থেমে নেই। তাই প্রদীপ্ত প্রদীপ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী আয়াতে কারিমাগুলো একটু অনুধাবন করতে চেষ্টা করি তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো যে, এই হরফের মূল মানদন্ড সমন্বয় সাধন করতে করতে সংক্ষেপে এই "সিন" হরফে এসে সমাপ্ত ঘটেছে। নূরময় বা আলোকময় প্রজ্জ্বলনকৃত ব্যবস্থা রূপক আকারে আল্লাহ্পাক তাঁর কালামপাকে ধারণ করে সন্নিবেশিত করেছেন। মুক্ত কথা এই নূরময় কালাম বা হরফের বহিঃপ্রকাশ হলো যিনি এই "সিন"-এ নিজেকে তৈরী বা রূপান্তর করেছেন তাঁর ভিতরেই এই প্রজ্জ্বলনকৃত ধারার প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ।

এখানে আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা যেমন:- কোরানুল মাজিদ সাত হরফে নাজেল হওয়ার বিষয়।

কোরানুল মাজিদ সাত হরফে নাজেল হওয়া

আল্লাহ্র হাবিব রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- এই কোরান সাতটি ভিন্ন হরফে নাজেল হয়েছে, সুতরাং কোরান হতে যা তোমাদের জন্য সহজতর হয় তা পাঠ কর। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

তিঁনি {(রাসুল) (সাঃ) (আঃ)} আরও বলেছেন:- জিব্রাঈল আমাকে একটি পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং আমি তা অনুশীলন করতে থাকা অবস্থায় সে আমাকে আরও পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আমি তার কাছে আরও প্রত্যাশা করতে থাকি এবং সেও বাড়াতে থাকে যতক্ষন না (সর্বমোট) সাতটি হরফ হয়। (বুখারী)

সাত হরফে কোরানুল মাজিদের নাজেলের বিষয়টি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বলেছেন:- জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে একভাবে কোরান শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং পুনঃ পুনঃ অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য পাঠ পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত হরফে তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত:- রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন কোরান-

৭ (সাত) প্রকারে অবতীর্ণ হয়েছে। তার প্রত্যেক আয়াতের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ অর্থ আছে এবং প্রত্যেক উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন উপায় আছে। (মিশকাতুল মাসাবীহ)

আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলেছেনঃ- কোরান ৫ প্রকারে অবতীর্ণ হয়েছেঃ-

(১) হালাল (বৈধ)।

(২) হারাম (নিষিদ্ধ)।

(৩) মুহকাম (স্পষ্ট)।

(৪) মুতাশাবিহ (রূপক)।

(৫) মিসাল (দৃষ্টান্ত)।

সাত হরফ-এর অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ উপনীত হয়েছেন, এটি মুতাওয়াতির পঠনে ভাষার প্রাঞ্জলতার মতভিন্নতা এবং সাতটি ভাষ্যে তা সংরক্ষিত হওয়া। যেমন, ইরাবের ভিন্নতা, (শব্দের) বেশি কিংবা কম হওয়া, কিংবা দ্রুততা কিংবা বিলম্ব হওয়া, পাক খাওয়া কিংবা পরিবর্তন হওয়া, শব্দের বিভিন্ন রূপ যেমন, সরু হওয়া কিংবা গুরুত্বারোপ করা, প্রবণ হওয়া কিংবা উন্মুক্ত হওয়া। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উপনীত হয়েছেন যে এগুলো আরব ভাষ্য যা মুতাওয়াতির পঠন দ্বারা সাব্যস্থ নয়।

অনেক গভীর পর্যালোচনা করার পর, অধিকতর শক্তির বিবেচনায় আমার উপলব্ধি অনুযায়ী সাত হরফ আরবদের বিভিন্ন গোত্রের উপভাষা (লাহাজাত) যা হতে মৌলিকভাবে আরবি ভাষাকে নেওয়া হয়েছে এবং যা কোরান নাজেল হবার সময়ে আরবির প্রাঞ্জলতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এর কারণ হচ্ছে কোরানুল মাজিদের পঠন মুতাওয়াতির হওয়া আরবদের গোত্রসমূহ হতে পৃথক কোনো বাস্তবতা ছিল না। কোরান নাজেলের সময় সাতটি সুপরিচিত প্রাঞ্জল আরবি উপভাষা ছিল। যা হলোঃ- (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

১) কুরাইশ।

২) তামিম।

৩) কায়েস।

৪) আসাদ।

৫) হুযাইল।

৬) কিনানাহ।

৭) তা'ঈ।

সুতরাং এ বিষয়ে (সাত হরফে) উক্ত সাতটি গোত্রের উপভাষা। তবে এক্ষেত্রে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কোরান এ সাত গোত্রের ভাষার যে কোন শব্দ দ্বারা পড়া যাবে এমনটি নয়, কেবলমাত্র যেসব বর্ণনা নবী (সাঃ) (আঃ) এর নিকট হতে মুতাওয়াতিরভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সেগুলোই পাঠ করা যাবে। কারণ মুতাওয়াতির বর্ণনার বাইরের কোনো বর্ণনার পঠন কোরান বলে বিবেচিত হবে না।

অনেকেই সাবআতুল আহরুফ বা কোরানের ৭ হরফ নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকেন এবং অভিযোগ করে থাকেন এটা নাকি কোরানের বিভিন্ন ভার্সন বা সংস্করণ (নাউযুবিল্লাহ)। অনেক সময়ে খ্রিষ্টান মিশনারী কিংবা নাস্তিক মুক্তমনারা বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত প্রাচীন কোরানের কপির কথা প্রচার করেন যেগুলোতে কিছু শব্দ ও বাক্য বর্তমানে প্রচলিত কোরান থেকে কিছুটা ভিন্ন। এভাবে তারা কোরানুল মাজিদের সংরক্ষণ ও সঙ্কলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তারা বলতে চান যে কোরানুল মাজিদ ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি এবং সাহাবীগণ কোরানুল মাজিদকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এসকল অভিযোগের স্বরূপ উপরোক্ত হাদিসের আলোকে কোরানুল মাজিদ সাত হরফেই নাজেল হয়েছে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। হরফ বহুবচনে আহরুফ অর্থ কিনারা, তট, কূলভূমি ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ্ কোরানুল মাজিদে বলেন (সূরা হাজ্জ ২২: ১১):- কিছু কিছু মানুষ আছে যারা দ্বিধার (প্রান্তে দাঁড়িয়ে) আল্লাহ্র ইবাদাত করে।

কোরানুল মাজিদের এই ৭ (সাত) হরফ আল্লাহ্ ও রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) কর্তৃক অনুমোদিত। এই সাত আহরুফ বা হরফসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী ?

উলামারা অনেক আগে থেকেই এই সাত হরফ দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত সম্পর্কে শায়খ সালিহ আল মূনাজ্জিদ বলেন:- এই বিষয়ে উলামাদের থেকে বর্ণিত সর্বাধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো যে, এই সাবআতুল আহরুফ কিরাতের সাতটি বিশেষ পদ্ধতি যা শব্দের দিক থেকে আলাদা হলেও অর্থের দিক থেকে এক, আর যদিও অর্থের দিক থেকে একে অপরের থেকে ভিন্নও হয়, তবে তা বৈচিত্র্যের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে একে অপরের বিরোধী নয়।

আমরা কোরানের হরফ সাতটির সামান্য পরিচয় জেনে নিই। কোরানে হরফ সাতভাবে ভিন্ন হতে পারে।

(১) ভিন্ন শব্দে একই অর্থ প্রকাশ।

(২) শব্দ ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য হওয়া।

(৩) শব্দের যোজন-বিয়োজনে অর্থের অভিন্নতা।

(৪) শব্দে আগ-পিছ হওয়া ও অর্থের অভিন্নতা।

(৫) ইরাবের ভিন্নতা ও অর্থের অভিন্নতা।

(৬) ওয়াক্বফে ভিন্নতা।

(৭) উচ্চারণে ভিন্নতা।

এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, এই সাত ধরনের হরফের কিরাত সবগুলোই রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর অনুমোদিত ও তাঁর থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমানিত। এর প্রমাণ উমর ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম (রাঃ) কে রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং -

গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তার কিরাত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাত পাঠ করেছেন' অথচ রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্ধত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাঁদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরা যে ভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে ? সে বলল, রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ)-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এরপর আমি তাকে জোড় করে টেনে রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, "তুমি পাঠ করে শোনাও" তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) (আঃ) বললেন, এভাবেই নাজেল করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে উমর! তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিঁনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, এভাবেও কোরান নাজেল করা হয়েছে। এ কোরান সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাজেল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ কর। এ রকমটা করা হয়েছে উম্মাতের জন্যে সহজীকরণের জন্যেই। নিম্নের বর্ণনা দুটিতে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম, এক ব্যক্তি প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। সে এমন এক ধরনের কিরাত করতে লাগল আমার কাছে অভিনব মনে হল। পরে আর একজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতে ভিন্ন ধরনের কিরাত করতে লাগল। সালাত শেষে আমরা সবাই রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিরাত করেছে যা আমার কাছে অভিনব লেগেছে এবং অন্যজন -

প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী জন হতে ভিন্ন কিরাত পাঠ করেছে। তখন রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তাদের উভয়কে (কিরাত পাঠ করতে) নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই কিরাত পাঠ করল। রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তাদের দু'জনের (কিরাতের) ধরনকে সুন্দর বললেন। ফলে আমার মনে রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর কোরানের প্রতি মিথ্যা অবিশ্বাস ও সন্দেহের উন্মেষ দেখা দিল। এমন কি জাহিলী যুগেও আমার এমন খটকা জাগে নি। আমার ভেতরে সৃষ্ট খটকা অবলোকন করে রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমার বুকে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম এবং যেন আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মহা মহীয়ান আল্লাহ্র দিকে দেখছিলাম।

রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) আমাকে বললেনঃ- ওহে উবাই! আমার কাছে (জিবরাঈল (আঃ) কে প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি যেন কোরানুল মাজিদ এক হরফে তিলাওয়াত করি। আমি তখন তাঁর কাছে পুনরায় অনুরোধ করলাম আমার উম্মাতের জন্য সহজ করুন। দ্বিতীয় বার আমাকে বলা হল যে, দুই হরফে তা তিলাওয়াত করবে। তখন তাঁর কাছে আবার অনুরোধ করলাম, আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিতে। তৃতীয় বার আমাকে বলা হল যে সাত হরফে তা তিলাওয়াত করবে এবং যত বার আপনাকে জবাব দিয়েছি তার প্রতিটির বদলে আপনার জন্য একটি সাওয়াল! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় প্রার্থনাটি বিলম্বিত করে রেখেছি সে দিনের জন্য, যে দিন সারা সৃষ্টি এমন কি ইব্রাহীম (আঃ) ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত যে :- রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বনূ গিফারের জলাভূমির (ডোবার) কাছে ছিলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকটে এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে আদেশ করেছেন যে আপনার উম্মাত এক ধরনের কোরান পাঠ করবে। তখন রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র কাছে তার মার্জনা ও মা প্রার্থনা করছি। আমার উম্মততো এ হুকুম পালনে সামর্থ্য হবে না। পরে জিব্রাঈল (আঃ) দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে আগমন করে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত দু'ধরনের কোরান পাঠ করবে । রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র সমীপে তার মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার উম্মততো তা পালনে সামর্থ্য হবে না।

তারপর তিনি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মত তিন হরফে কোরান পাঠ করবে। রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র সমীপে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মত তো এটি পালনের সমর্থ রাখে না। তারপর জিব্রাঈল (আঃ) চতুর্থ বার রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত সাত হরফে কোরান পাঠ করবে এবং এর যে কোন হরফ ও ধরন অনুসারে তারা পাঠ করলে তা-ই যথার্থত হবে।

আর এই কিরাতগুলো আমরা বিভিন্ন ইমামদের নামে চিনে থাকলেও এর মূল সূত্র রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছে। উল্লেখ যে, স্বল্পসংখ্যক রাবী দ্বারা বর্ণনাকৃত (মুতাওয়াতির নয় এমন), কোনো অপরিচিত (গাইরি মাশহুর), মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণিত, মাওদ্বু (জাল-বানোয়াট) সনদে বর্ণিত ও শায (বিরল) ধরনের কিরাত গ্রহনযোগ্য নয়। কিরাতের বিখ্যাত ইমামদের নাম নিম্নরূপঃ-

১। নাফিঈ ইবনু নুয়াইম।

২। আসিম বিন নুজুদ।

৩। হামযাহ বিন হাবিব আল কুফি।

৪। ইবনু আমির।

৫। আবুল হাসান কিসাঈ।

৬। ইবনু কাছির।

৭। আবু আমর ইবনু আলা।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ- কোরান যদি সাত হরফেই হয়ে থাকে তাহলে লাওহে মাহফুজে কোন হরফের কোরান সংরক্ষিত আছে ? উত্তরঃ এর জবাব হাদিসেই আছে। রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) বলেছেন, জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে একভাবে কোরান শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) মানুষের সুবিধার জন্যে -

জিব্রাঈল (আঃ) এর কাছে অন্যান্য হরফ শিখাতে অনুরোধ করেছেন তারপর জিব্রাঈল (আঃ) সাত হরফে কোরান শেখান। অর্থাৎ, কোরানুল মাজিদ প্রথমে যেভাবে নাজেল হয়েছিলো সেই কোরানই লাওহে মাহফুজে সংরক্ষণ করা আছে।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ- কোরান সংরক্ষণের দায়িত্ব তো আল্লাহ্ই নিয়েছেন তাহলে এই কোরান নিয়ে এত মতপার্থক্য কেন হবে ? উত্তরঃ এগুলো মোটেই কোনো মতপার্থক্য নয়। এতে কোরানুল মাজিদের চিরন্তন সত্যে একটুও ফাঁটল ধরেছে না। আর পূর্বেই পরিষ্কার করা হয়েছে যে এই মতপার্থক্যের ধরন কেমন।

উপরে কোরানুল মাজিদের ৭টি হরফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক সময় খ্রিষ্টান প্রচারক কিংবা নাস্তিকরা বিভিন্ন প্রাচীন কোরানের আংশিক অংশ দেখিয়ে দাবি করতে চান যে, এগুলোতে সামান্য শব্দ ও বাক্যের পার্থক্য প্রমাণ করে যে কোরান নাকি বিকৃত হয়ে গেছে! উপরের আলোচনা দ্বারা তাদের অপযুক্তির অপমৃত্যু হয়। যেসব খ্রিষ্টান প্রচারক এইসব ভিন্ন হরফ কিংবা কিরাত দেখিয়ে দাবি করতে চায় যে, কোরানের ভিন্ন ভার্সন আছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলব, কোরানুল মাজিদের ভিন্ন হরফগুলো আল্লাহ্ ও রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) কর্তৃক অনুমোদিত।

পরিশেষে বলব, কিরাতের কিংবা আহরুফের পার্থক্যের কারণে কোরানুল মাজিদের বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করা অজ্ঞতা ও বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। বরং তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোরান টিকে আছে পীর, মোর্শেদ, ওলি, নবী-রাসুল বা আল্লাহ্র প্রতিনিধিগণের দ্বারা। যাঁরা কোরানকে দেহ ভান্ডে ধারণ করেন। যাঁরা আজও জমীনের বুকে হাঁটেন। যাদের মধ্যে আরবির প্রাথমিক জ্ঞানও নেই এমনও অনেকে আছেন। আর কোরানের হাফেজরা জাগতিক ভাবে মুখস্ত বিদ্যায় কোরানকে পাঠ করছে। তবুও তারা সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষার একটি কিতাব আগাগোঁড়া মুখস্থ করে রেখেছেন, যার সামান্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত আর কোনো কিতাব এই ধরণীর বুকে পাওয়া যাবে না।

তাহলে উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক দুইটি বিষয় সম্পর্কে বাস্তব সম্মত ধারণা পেলাম। তাই প্রথম আয়াতে অর্থের বিন্যাস করা হলো:- ইয়াসিন। অর্থ:- হে প্রদীপ্ত প্রদীপ।

বিজ্ঞানময় কোরান

দ্বিতীয় আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- ওয়াল্ কুরআনুল্ হাকিম্। অর্থ:- সাক্ষী এই বিজ্ঞানময় কোরানের। হাকিম শব্দটির অর্থ আমরা জেনে থাকি জজ বা জাষ্ট্রিস, যাকে বিচারক বলে। আসলে এখানে বিজ্ঞানময় অর্থটাই বেশিরভাগ তাফসিরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেন বিজ্ঞানময় কোরান ? জাগতিক ভাবে বিজ্ঞানের যে অবয়ব সেটা সম্পর্কে বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা এটা বুঝলে আমাদের জন্য সহজ হবে। বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Science। বিজ্ঞানের আভিধানিক অর্থ বিশেষভাবে লব্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞান শব্দের বিশ্লেষিত রূপ (বি + জ্ঞান) "বি" অর্থ বিশেষ আর জ্ঞান অর্থ সম্মক ধারণা। ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ বিশেষ জ্ঞান বা প্রাপ্তফল অর্জনের প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞান বলে। তাহলে এখানে পরীক্ষাও থাকতে হবে, নিরীক্ষাও থাকতে হবে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেই হবে না সে পদ্ধতি বা সিস্টেম মাফিক যেন পরিচালনা হয় সেই ব্যবস্থাটাও থাকতে হবে। এই জ্ঞান স্বাভাবিক জ্ঞান নয়। যেটা ভাববাদী ব্যবস্থায় বা লব্ধ একটি প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে নিহিত। সেই ব্যবস্থাপত্রকেই বলা হলো যে, একটি "হরফ" তার ভাবনা থেকে সৃজনকৃত ব্যবস্থা স্থানান্তরিত হয়ে এর কার্যকারিতার প্রতিফল ঘটিয়ে যে অর্জন সেটাই হলো বিজ্ঞানের অর্জন (কোরানের ভাবধারার আলোকে আলেচ্য বিষয়)। অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাবে যারা সাধক তারাও কিন্তু ভাববাদী ব্যবস্থায় গবেষণার মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র নৈকট্য বা আল্লাহ্র নূরময় জারীয়া, আল্লাহ্র মাকাম বা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সৃষ্টির রাজ্যের যত কিছু রয়েছে সকল কিছু সম্পর্কে দৃশ্যায়নের দিকে ধাবিত হয়। তাহলে সেই প্রক্রিয়া মাফিক তাকে গমন করতে হয়।

এজন্য বলা হয়েছে সাক্ষী সেই বিজ্ঞানময় কোরানের। নূরময় অবস্থাটা পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই এই আয়াতে প্রকাশ বিজ্ঞানময় কোরান। অনেকেই আবার নূরকে অস্বীকার করে যা যুক্তি যুক্ত নয়। কারণ নূরের বিষয়টা উপলব্ধি হলো আধ্যাত্মিকতার। এটাকে স্বীকার করলে আধ্যাত্মিক বিষয় স্বীকৃত পায়। যিনি মানবে না তার জন্য বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া ভাল। বুঝবার জন্য দৃষ্টান্তগুলো উপস্থাপন রইল। আল্লাহ্র নবী-রাসুলেরা আল্লাহ্র নূরী কোরান হতে যে জ্ঞান -

দান করে থাকেন, সেই জ্ঞানের ভাষা গুলোকেই এক একটি সহিফা বলে। যেমন তাওরাত একটি সহিফা, জবুর একটি সহিফা, ইঞ্জিল একটি সহিফা এবং সর্বশেষ কোরানুল মাজিদ হলো বড় সহিফা। সব মিলে একশত চার খানা সহিফার কথা জানা যায়। তবে অন্যান্য সহিফার নাম গুলো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেহেতু অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ গুলোকে সুনির্দিষ্ট ভাবে সহিফা বলে উল্লেখ করতে চাই না কারণ ইহাতে মতভেদ ও তর্ক-বিতর্কের প্রশ্নটি এসে যাবার প্রচুর সম্ভবনা থেকে যায়। তাই এটা কাগজ বা কালির বিষয় নহে। একজন মহাপুরুষ আলোকবর্তিকা প্রাপ্ত হয়ে সেই আলোর সুতা দিয়ে অন্যকে আলোকিত করেন। এই নূরময় অবস্থা ধারাবাহিক প্রণালীতে ধীরে ধীরে কার্যকারিতা, ফলপ্রসূ বা সফলতা এই ব্যবস্থাকে আয়াতে কারিমার দ্বারা পরিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য দ্বিতীয় আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- ওয়াল্ কুরআনুল্ হাকিম্। অর্থ:- সাক্ষী এই বিজ্ঞানময় কোরানের। (সূরা নূর, আয়াত : ৩৫ দ্রষ্টব্য)

মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) রাসুলগণের মধ্য হইতে

তৃতীয় আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- ইন্না কালা মিনাল্ মুর্ছালিন্। অর্থ:- আপনি {(মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)} রাসুলগণের মধ্য হইতে। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্র প্রিয় হাবিব মোহাম্মদকে (সাঃ) (আঃ) নির্দেশ করা হয়েছে যে, আপনি রাসুলগণের মধ্য হইতে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যে অসংখ্য রাসুল সৃষ্টিরাজ্যে প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য হইতে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাই এখানে মুরসালিন শব্দের অর্থ রাসুল করা হয়েছে। যদিও আমরা যারা ভাববাদী ব্যবস্থায় মানব-মানবীগণ দুনিয়াতে অবস্থান করে থাকি তাদের ভাষায়:- রাসুলপাক যদি কাউকে দর্শন দান করেন, তাহলে তা এই মুরসালিন রূপেই দর্শন দান করেন। এখন এই মুরসালিন হলো সকল অবয়বে। আমাদের মৃত্যুর ঘন্টা বেঁজে গেলে শেষ হিসাবে মনে করি কিন্তু আসলে এটা শেষ নয়, এটা রূপান্তর। কারণ এই দেহটার মৃত্যু ঘটে আত্মার নয়। আত্মা যদি এই দেহধারী ব্যবস্থার মধ্যে সৃজনকৃত অর্থাৎ স্থানান্তরিত ব্যবস্থায় জাগরিত হতে পারে তাহলে তার সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল হয় (যদিও বিষয়টি গুরুবাদ)। অর্থাৎ তাঁর জাগরণ এমন একটি প্রক্রিয়াতে যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সন্নিবেশিত হয়ে এক থেকে সে বহুতে রূপান্তর ভাবধারায় বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতে পারে। তাঁকে ডাকলে সে সাড়া দেবার ইচ্ছা করলে সাড়া দেয়।

সেই সাড়া দেওয়ার যে বাহন সেটাই আত্মা রূপের অবয়ব। কিন্তু আসলে দেহটা স্থানান্তরিত এভাবে খুব কমই হয়ে থাকে। তাহলে এই আত্মার ব্যবস্থায়ন সম্পর্কে যে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ বিশেষত্ব ফকিরিতে এটা বলে থাকি সাধক তাঁর কালামে বলেন যেমন:- হায়াতে মুরসালিন কোরানেতে লেখা দেখি, দ্বীনের রাসুল মারা গেলে আমি কেমনে সুখে থাকি, রাসুল রাসুল বলে ডাকি! তাই এই মুরসালিন রূপেই রাসুলপাক (সাঃ) (আঃ) হাজির নাজির বা দর্শন দিয়ে থাকেন।

এজন্য মুরসালিন রূপ পেতে বেশিরভাগ অনুবাদকগণ রাসুল শব্দের অবতারণা করেছেন। কিন্তু আমরা যারা ভাববাদী আলোচনাকারী গণ এই মুরসালিন রূপে যে একজন রাসুলের (সাঃ) (আঃ) আগমন হয়, সেই আগমনটা আসলে Present বা বর্তমান। এটা অতীত বা ভবিষ্যৎ নয়। অর্থাৎ পরবর্তীতে রূপান্তর যে ব্যবস্থা সেটা আরও দুইটি Subject ক্রিয়ার কাল বা সময়। তাহলে এই সময়কে সদা বর্তমান মুরসালিন হিসাবে এই আয়াতে প্রকাশ হয়েছে যে:- ইন্না কালা মিনাল্ মুর্ছালিন্। অর্থ:- আপনি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) আঃ)} রাসুলগণের মধ্য হইতে। এখানে নিশ্চয়ই যে তিঁনি রাসুলগণের মধ্য হইতে। তাহলে রাসুল (সাঃ) (আঃ) হিসাবে তাঁর মুরসালিন রূপের যে একটি স্বীকৃতি, এটা আত্মশুদ্ধিতে বিস্তৃত ভাবধারায় তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে। অর্থাৎ মানব আকৃতিতে তিঁনি দুনিয়াতে আসবার পরে সাধন-ভজন (মোরাকাবা মোশাহেদা) ক্রিয়াকলাপ বা তপস্যা, তপজপ যা কিছু কর্ম করেছেন সেই কর্মের দ্বারা তিঁনি এই যোগ্যতায় উপন্নিত হয়েছেন। ইনন্া অর্থ নিশ্চয়ই। তাই আয়াতে কারিমায় নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে:- নিশ্চয়ই আপনি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) (আঃ)} রাসুলগণের মধ্য হইতে। তাহলে ঐ প্রক্রিয়াতে তিঁনি সমাসীন হয়েছেন। আল্লাহ্পাক যুগে-যুগে, কালে-কালে যত নবী-রাসুলগণ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সেই সনদের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে এই তৃতীয় আয়াতে মুরসালিন শব্দ দ্বারা রাসুলের স্বীকৃতি সনদে।

এগুলো হলো ভাববাদীর বিস্তারিত বর্ণনার ধাপে ধাপে সূরাটির একটি ব্যাপকতা পাচ্ছে কিন্তু সূচনাতে ছিল একটি হরফ দ্বারা। তাহলে একটি হরফ থেকে সন্নিবেশিত হতে হতে পর্যায়ক্রমে যখন নিচের দিকে আসছে তখন আল্লাহ্পাক ঐশি বাণী দ্বারা তাঁর হাবিবকে নির্দেশ করিতেছেন। তৃতীয় আয়াতে এই -

মুরসালিন শব্দের মাধমে রাসুলের দলভুক্ত বা অন্তরভূক্তির সনদ দান করলেন। এটাই ছিল মূল ধারার অবয়ব যা কোন মানব-মানবী যদি তার ক্রিয়া বা কর্মের সম্পাদনের দ্বারা সে ঐ অবয়বের দলভূক্ত বা সনদে জারী হয় তাহলে সে জানতে পারে। এজন্য বিশেষ্যত্ব ফকিরিতে বা ভাববাদীতে অনেকেই বলে থাকেন শরিয়তে যেটা দ্বিধা বিভক্তকর একটি বয়ান সেটা হলো:- কোরান নাজিল হয়েছে কিন্তু কোরান নাজেল। কোরান নাজিল হয়েছে এই কথার অর্থ হলো অতীত কিন্তু কোরান নাজেল এই কথার অর্থ হলো কোরান হাজির নাজির বা বর্তমান। নাজেল যদি বর্তমান হয় তাহলে এটা কনোষ্টেন্ট নীতিতে সমাসীন রয়েছে অর্থাৎ সকল সাধকগণের এটা বোধগম্য। যারা এই বিষয়ে সাধনা করেন নি তারা এই বিষয়টা বুঝবে না। তাই তাদের ভাষায় কোরান নাজিল হয়েছে আর যারা নাজেল প্রক্রিয়াতে অবগত তাঁরা এই বিষয়ে বর্তমানেও কার্যকারিতা রয়েছে। এজন্য মুরসালিন শব্দটাও এমন যে, কোন মাহফিলে রাসুল (সাঃ) (আঃ) সমাসীন হয় তাহলে তিঁনি মুরসালিন রূপেই হয়ে থাকে। কোন বান্দা বা বান্দী যদি রাসুলের (সাঃ) (আঃ) সাক্ষাৎ পায়, সেটা স্বপ্ন যোগেই হোক, তন্দ্রা যোগেই হোক বা ভাব-বিষয়কই হোক, সেটা এই মুরসালিন রূপেই তিঁনি উম্মতকে দর্শন দান করেন। তাহলে এই মুরসালিন হলো রাসুলগণের মধ্য হইতে। তাই আল্লাহ্পাক কালামপাকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। এখানে কোন দ্বিধা-দন্ড বা বিভক্তির অবকাশ নেই, যে আপনি রাসুগণের মধ্য হইতে। এজন্য আয়াতে কারিমায় এক বাক্যে বলে দেওয়া হলো:- ইন্না কালা মিনাল্ মুর্ছালিন্। অর্থ:- আপনি {(মোহাম্মদ) (সাঃ) (আঃ)} রাসুলগণের মধ্য হইতে।

মুস্তাকিম বা সত্য সঠিক পথ

চতুর্থ আয়াতে আসলো:- আলা সিরাতিম মুস্তাকিম্। অর্থ:- আমাদেরকে মুস্তাকিমের (সত্য/সঠিক) পথে পরিচালনা করুন। "সঠিক রাস্তার উপরে" আল্লাহ্র পথ সমূহই সিরাতিম মুস্তাকিম। এই মুস্তাকিমের অনুবাদ করা হয় সহজ সরল পথ কিন্তু আদৌ এটা সহজ সরল পথ কি না যিনি ধ্যান সাধনা (মোরাকাবা মোশাহেদা) করেন নি তাকে বোঝানো দায়। "সুবুলানা" অর্থ পথগুলি, মানুষ নির্মিত পথ না আল্লাহ্ নির্মিত পথ। আল্লাহ্ নির্মিত পথ হলো তৌহিদ রাজ্য নিজের ভিতরে থাকা লোভ, মোহ, অহংকার, হিংসা, গিল্লা-গিবত, পরশ্রীকাতরতা এগুলোকে চিরতরে দূর করা বা আল্লাহ্মুখী করে চলমান

রাখার যে বিদ্যা সেটাই "সুবুলানা" বা আল্লাহ্‌র পথগুলি। তাহলে এই তৌহিদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে খান্নাসের কুমন্ত্রণার বাঁধার দেয়াল কিভাবে সরাতে হয় তা কেবলমাত্র মোরাকাবা মোশাহেদার বা ধ্যান সাধনা ব্যতীত হয় না। তাই আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবিব হেরা গুহায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করার পর যে সত্যের জাগরণ হলো, তা নগদের বার্তা দিলেন উম্মতে মোহাম্মদীকে। আল্লাহ্‌পাক তাঁর কালামপাকে কাহাফের ঘটনা জানালেন। এই ভাবে মহামানবগণ কালে-কালে যে প্রকৃত পথ দেখান সেটাই মুস্তাকিমের পথ। দুঃখ জনক হলেও সত্য এই সকল মহামানবগণের আচার-আচরণ অন্যান্য নির্দেশ নামাগুলো শোভা পায় কিন্তু মোরাকাবা মোশাহেদার বিষয়গুলো ভাটা পরে যায়। আবার এই পথের কোন দিশা দানকারী এটাকে উন্মুক্ত না করলে বিলুপ্ত ঘটে যাবার সম্ভবনা হয়। এভাবেই আমরা ভাষার শৈলীতে মুস্তাকিম বা সহজ সরল পথ বুঝে থাকি। কিন্তু প্রকৃত মুস্তাকিম উদ্ধার হওয়া জটিল বটে। সূরা ফাতেহাতেও মুস্তাকিম শব্দটা আসছে। নাস্তাঈন থেকে মুস্তাকিম শব্দের উৎপত্তি। এ বিষয়ে পূর্বেই আমার লেখা বই আধ্যাত্মিক লিপিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় নাম হলো মুস্তাকিম। আল্লাহ্‌র যত বিশেষণের পথ আছে সেই পথের মধ্যে উত্তম দিশা বা গাইড হলো এই মুস্তাকিমের পথ।

এই মুস্তাকিম শব্দকে যদি ভাঙ্গা হয় বা পৃথক করা হয় তাহলে নাস্তাঈন হয়, যার বাংলা অর্থ "মাস্তান"। জাগতিক ভাবে আমরা মাস্তান বলতে সন্ত্রাসীকে বুঝে থাকি। যারা বিধ্বংসী কার্যকলাপের মাধ্যমে জনমনে ভীতির উদ্বেগ ঘটায়, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা উপেক্ষা করে যিনি নিজের বড়াই, অহংকার, শক্তি দিয়ে আইন-কানুন রীতিনীতি না মেনে অবৈধ ভাবে মানুষের উপর বল প্রয়োগ করে থাকেন যা আইনের বহির্ভূত কার্যকলাপ। কিন্তু ভাববাদী ব্যবস্থায় মাস্তান আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় একটি নাম, এটা আমরা বাংলা ভাষাতে বুঝে থাকি। আসলে মাস্তান হলো (ঐশী প্রেমে মত্ত বা দিওয়ানা, প্রেম পাগল) যিনি বিষয় রাশির যত রকম ব্যবস্থাপত্র থাকুক না কেন সেটা ভোগ-মোহ বা নিজের অভিপ্রায় হোক সকল কিছুকে বর্জন করে একমাত্র আল্লাহ্‌তে যিনি সমাসীন রয়েছেন তিঁনিই মাস্তান। অর্থাৎ জাগতিক বিষয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়, কোন বিষয়কেই তিঁনি মূল্যায়ন করে নি আল্লাহ্‌ ব্যতীত। শুধুমাত্র স্রষ্টার মূল্যায়নে অধিষ্ঠ ব্যবস্থার দিকে তিঁনি ধাবিত বা নিজেকে মেলে ধরেছেন। তাঁর মনোরাজ্যে অন্য কোন অবাঞ্চিত ব্যবস্থার পরিস্ফুটন বা সন্নিবেশিত করতে -

পারে নি, তিঁনিই এই মাস্তান। আমরা হর-হামেশা তরিকতে অনেক মস্তানকেই দেখে থাকি। কিন্তু তাদের বিষয়রাশি, লোভ, মোহ বা কোরানুল মাজিদের যে নির্দেশনামা এই নির্দেশনামার সাথে তাদের কার্য হুবহু মিলে না, অনেক সময় কম/বেশী দেখা যায়। এর অর্থ হলো তিনি চেষ্টায় রত আছেন কিন্তু প্রকৃত মাস্তানের যে খেতাব, সেই খেতাব হলো সকল বিষয়রাশিকে সে অবাঞ্চিত করে সেগুলো থেকে ডাইভার্ড বা পৃথক হয়ে বের হয়ে এসেছেন। এজন্য আল্লাহ্‌র এত প্রিয়ভাজন সে হয়েছে। যার জন্য এই সরল সোজা পথকে বলা হয় মুস্তাকিমের পথ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিশার পথ বা যে পথে আল্লাহ্‌র প্রাপ্তি ঘটেছে, যে পথে আল্লাহ্‌র সকল কারিকুলামে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন।

এই সৃষ্টি রাজ্যের যা কিছু রয়েছে একমাত্র মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত সকল মাখলুক বা সৃষ্টি আল্লাহ্‌র তৌহিদ রাজ্যে বাস করে। আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্টিরাজ্য এত বেশি অপূর্ব সৌন্দর্যময় করে সৃষ্টি করার কারণে আমরা স্বভাবতই এর মোহে পরে যাই। যার জন্য এই সৃষ্টির প্রতি মানুষ অত্যাধিক আকর্ষিত। এটাই স্বাভাবিক। এই আকর্ষিত হবার কথা ছিল স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের প্রতি বা স্রষ্টার প্রেমের প্রতি কিন্তু নিজের মোহগ্রস্থতা জাগরিত হবার কারণে সুফল মিলে না। এই দুনিয়াবী আকর্ষিত ব্যবস্থাকে সরিয়ে যিনি পরিপূর্ণতার দিকে গমন করেন অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌কে প্রাপ্তির দিকে যিনি মনোনিবেশ করেছেন, সেই পথে বা ব্যবস্থাপত্রে ঝাঁপ দেবার পর স্রষ্টা যখন তার ঝাঁপ দেওয়াকে কবুল করে নেন, তখন তাঁকে উত্তরণ করেন, সেই পথে তার প্রাপ্তি ঘটিয়ে সুনিশ্চিত করে দেন। এই পথকেই বলা হয় মুস্তাকিমের পথ। এজন্য বলা হয় আমাকে তোমার সরল সোজা পথের দিশা দাও বা পরিচালনা কর, সেই পথে গ্রহন কর, এভাবে প্রার্থনাতে বা সূরা ফাতেহাতেও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মূল বিষয় হলো এই পথে পরিচালনা হবার আকুতি মহান আল্লাহ্‌পাকের নিকট, এই পথই আল্লাহ্‌র প্রিয় পথ। সকল অবাঞ্চিত ব্যবস্থাকে পথ হতে সরিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌কে চাওয়া, আল্লাহ্‌কে হাজির নাজির জানা, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের পথ, আল্লাহ্‌কে প্রাপ্তি লাভের পথ, সেই পথের কার্যাবলি ফলপ্রসূ হলো আল্লাহ্‌ এবং বান্দার মিলনের একটি সহজ সরল ব্যবস্থা। সেই পথের দিকনির্দেশনা মুস্তাকিম হিসাবে গৃহিত হয়েছে। এজন্য মুস্তাকিমকে এত মর্যাদাবান করা হয়েছে।

সমগ্র কোরানুল মাজিদে যে চারটি শ্রেণী রয়েছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ্পাক সরাসরি থাকেন, তার মধ্যে মুস্তাকিম একটি। এই মুস্তাকিম হতে হলে আধ্যাত্মবাদের আলোকে বলা হয়েছে যে, বিষয় রাশির যত অবাঞ্চিত ভাবনা আছে সকল ভাবনা থেকে নিজেকে বের করতে বা উত্তোলন ঘটাতে হবে, একমাত্র আল্লাহ্তে লীন হওয়া এটা প্রমাণিত হতে হবে। কখন প্রমাণিত হবে ? মওলা যখন আপনার এই কার্যকে গৃহিত করবেন তখনই এটা কার্যকারিতা বা ফলপ্রসূ হবে। তখনই এই পথের দিশা বা মুস্তাকিমের সনদ বহিঃপ্রকাশ হবে, তখনই পরিপূর্ণতার রূপ পাবে। এই লকব বা পথকে তুঁমি (আল্লাহ্) এত মর্যাদাবান করেছ সেই পথের দিকে পরিচালিত করুন। আমাদেরকে তোমার সেই সরল সঠিক পথ বা তোমার সেই প্রিয় ভাজনদের পথ বা মুস্তাকিমের পথ, সেই প্রক্রিয়াতে যাবার জন্য আল্লাহ্পাক সবাইকে নির্দেশ করেছেন। মুস্তাকিমের সনদ হলো যার সঙ্গে আল্লাহ্পাক সরাসরি থাকেন।

তাহলে আল্লাহ্পাক বান্দার সঙ্গে সরাসরি থাকবার পরেও আমরা আরও তিনটি স্তর অতিক্রম করে আল্লাহ্র সন্নিবেশিত একটি প্রক্রিয়াতে, সেই তিনটি ধাপের সফল চূড়ায় রয়েছে "ইয়াসিন"। অর্থাৎ বান্দা যদি আল্লাহ্র সংযোগ প্রাপ্ত হয় তাহলে তিঁনি মুস্তাকিমের লকব প্রাপ্ত হয়, অতঃপর আরও তিনটি ধাপ অতিক্রম করবার পরেই এই "ইয়াছিন"। আল্লাহ্কে লাভ করবার পরেও যে স্তর বিন্যাস রয়েছে তার ধারাবাহিক প্রণালীর বর্ণনাগুলো কোরান এভাবে দিয়েছে। এই ধারাবাহিক বর্ণনাগুলো যদি ধাপে ধাপে বুঝতে যাই, তাহলে ইহা লিখে শেষ করা যায় না। যার জন্য সংক্ষেপে রইল।

মূল ধারায় কোন ব্যক্তি যেতে চায় তাহলে তার সূচনাতেই তো গুরু লাগবে। এই গুরুবাদী মাধ্যম ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরবার কথা বলা হয়েছে। যেমন মুস্তাকিমের পথে আমি যেতে চাই বা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খা মেটাতে চাই, তো এটা শুধু শুধু ইচ্ছা করলেই হয় না। এই প্রক্রিয়াতে জাগতিক ভাবে ধর্মের কিছু বিধি-বিধানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন থাকে না। যার জন্য ধর্মের প্রাণ সঞ্চালন ব্যবস্থাটা জাগতিক ভাবে থাকে না। প্রাণ সঞ্চালন ব্যবস্থা থেকে থাকলে গুরুবাদী বা আহলে বায়াত বা ফকিরি ইত্যাদি মতবাদ স্বীকৃতি পেয়ে যায়। যারা কামেল ওলি মোর্শেদগণ রয়েছেন তাদের সৃজিত ভাবধারাতেই ধর্মের প্রাণ সঞ্চালন ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। যার জন্য ওলিদের ভাবধারা একটু ভিন্নতার-

হয়ে থাকে। এজন্য আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলা বলতেন:- পীর বড় নয়, সত্য লাভ করাটাই বড়। গাউসে খোদা মুশকিল কুশা গাউসুল আজম রইসুল আরেফিন পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি, গাউসে সামদানি শেখ সৈয়দ মওলানা মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী আল-হাসানী ওয়াল-হুসায়েনী (আঃ) বলেছেন যে :- "যখন তুমি কোন পীরের নিকট গমন কর, তখন জাহেরী বিদ্যা পরিত্যাগ করে যাইও"। এই জাহেরী বিদ্যা পরিত্যাগ করার অর্থ হলো এটা বাদ দেওয়া তা নয়। ওলিদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা একটু ভিন্নতার, তাই ভিন্নতার মানদন্ড সমুন্নত রাখতেই এমন নির্দেশনামা। এজন্য বড় পীর সাহেব হয়ত এমন দিক নির্দেশনা মূলক বাণী উল্লেখ করেছেন।

তাই মুস্তাকিমের পথে যেতে হলে প্রাথমিক সূচনাই হলো গুরু বা মোর্শেদ। সেই মোর্শেদের আশ্রিত ব্যবস্থায় নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পিত করাটাই হলো এই ধারার সূচনা। কারণ স্রষ্টাকে সরাসরি পাবার কোন বিধান নেই। এটার উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ্পাক মুসা কালিমুল্লাহ্কে দিয়ে নিদর্শন দেখিয়েছেন। যার বর্ণনা সূরা কাহাফে সন্নিবেশিত হয়েছে। মুসা কালিমুল্লাহ্ আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্র জালুয়াতে তুর পাহাড় পুড়ে সুরমায় রূপান্তর হয়েছিল এবং মুসা নবী জ্ঞান হারিয়ে অচৈতন্য হয়েছিল। পাহাড়ের সন্নিবেশিত একটি স্থান বা জায়গা থেকে গায়েবী ভাবে আওয়াজ আসে, আমি তোমার মাবুদ বলছি। এই তুর পাহাড়ে মুসা কালিমুল্লাহ্'র ঘটে যাওয়া ধারণকৃত সাক্ষ্যতা। কিন্তু ওলিদের যুগে এসে আমরা পাই যে সন্নিবেশিত দেহ আত্মার সংমিশ্রনে এটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যেমন:- অদ্বৈতবাদী সুফি যাঁরা ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্তে রূপান্তর বা আল্লাহ্তে লীন ও আল্লাহ্ সত্ত্বায় অভিন্ন হয়ে যাওয়া সাধনা করেন তাঁরাই সিদ্ধিশেষে বলেন "আনাল হক" অর্থাৎ বাবা আবু মুসা ইবনে মুনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন "আনাল হক" অর্থ আমিই আল্লাহ্ বা আমিই সত্য বা আমিই পরম সত্ত্বা। বাবা বায়োজিদ বোস্তামী বলেছেন:- "লাই ছালাফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্তাআলা" অর্থ আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই নেই। অদ্বৈতবাদী সিদ্ধ সাধকরা বলেন :- "সোহ্হম" অর্থাৎ আমিই পরমব্রহ্ম। যার প্রমাণ হিসাবে এই ধারাকে সৃজনশীল বা কার্যকর করবার জন্য আবাদানের (খিজির আঃ) কাছে মুসা কালিমুল্লাহ্কে আল্লাহ্পাক প্রেরণ করেন।

অর্থাৎ সূরা কাহাফের বর্ণনায় ঘটনাটি এসেছে। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি। মুসা কালিমুল্লাহ্ (আঃ) আল্লাহ্র সঙ্গে কথোপকথনে বললেন যে, হে আল্লাহ্! দুনিয়াতে হয়ত আমাকেই আপনি অধিক জ্ঞানী করেছেন। আল্লাহ্পাক বললেন, তুঁমি এই ধারণা পোষণ করেছ! তাহলে তুঁমি যদি জ্ঞানের ধারা জানতে চাও, বুঝতে চাও বা শিখতে চাও, তাহলে একজনের কাছে পৌঁছাও। মুসা কালিমুল্লাহ্ বললেন, তাহলে আমার চেয়েও জ্ঞানী রয়েছে! আল্লাহ্পাক বললেন তুঁমি কি তাঁর সাক্ষাৎ পেতে চাও ? তখন মুসা নবী বললেন হ্যা, আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেতে চাই। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জানানো হলো তুমি দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে পৌঁছাও এবং সেই দিকে গমন কর তাহলে তুঁমি আবাদানকে (খিজির আঃ) পাবে। কোরানের বর্ণনায় এসেছে হলো আবাদান (বাংলায় আবদুহু বলা হয়) কিন্তু আমরা প্রচলিত ভাব ধারায় যাকে রূপান্তরে খিজির (আঃ)-এর নাম শুনে বা জেনে থাকি। এরকম অবস্থায় মুসা কালিমুল্লাহ্ আল্লাহ্পাকের কাছে বললেন, আমিতো যাবো কিন্তু আমার ভাই হারুনকে সঙ্গে নিয়ে যাই ? আল্লাহ্পাকের কাছ থেকে এজাযত নিলেন এবং বললেন আমি নিয়ে যাবো কিন্তু আমি আবাদানকে পেলেই আমার ভাইকে বিদায় দিব। বিভিন্ন তাফসিরে ব্যাখা করা হয়েছে যে, একটা জ্যান্ত কৈ মাছকে ভাজি করে ব্যাগ বা থলেতে ভরে সেই মাছটি নিয়ে যাওয়া হলো। এই মাছটি নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য হলো দুই সমুদ্রের মিলন স্থল কোথায় এটা নির্ধারিত করবার জন্যই নেওয়া হয়। সেই স্থানে গেলে গায়েবী মোজেজায় কৈ মাছটি প্রাণ ফিরতেই সে যে দিক দিয়ে রওনা করবে সে দিকটাই হবে দুই সমুদ্রের মিলন স্থল।

দুই ভাই যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে মুসা নবী কিছুটা ক্লান্ত অবস্বাদ গ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর ভাইকে বললেন আমি একটু বিশ্রাম নিব। তখন মুসা কালিমুল্লাহ্ নিদ্রাগত হয়ে বিশ্রাম করেন এবং তাঁর ভাই অতন্দ্র অবস্থায় পাশে ছিলেন। বেশ কিছু সময় পরে কৈ মাছটি প্রাণ ফিরে পেলে লাফিয়ে থলের মধ্য হইতে বের হয়ে গেল। হারুন জানে যে মুসাতো নবী বা পয়গাম্বর এজন্য নিজ থেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সেটা বেয়াদবি হয়ে যাবে। তো কিছু সময় পরে মুসা কালিমুল্লাহ্'র নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং আবার রওনা হবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কিছু দূর যাবার পর মুসা কালিমুল্লাহ্ ভাই হারুনকে বললেন, দেখি ব্যাগটা দাও তো। ব্যাগটা নিয়ে প্রশ্ন করলেন ব্যাগের মধ্যে মাছ তো নেই ? তখন ভাই হারুন বললেন, আপনি যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ঐ দিকে মাছটি

প্রাণ ফিরে পেয়ে চলে গেছে। তখন মুসা নবী বললেন, তাহলে আমরা অনেকটুকু পথ সেই স্থান হতে চলে এসেছি, তাই আবার পিছনে ফিরে যেতে হবে। কারণ এই মাছের দিশাটাই হলো আমার পথের দিক নির্দেশনা সনাক্ত করবে। যেহেতু বালুময় পথ তাই মাছটি যে দিক দিয়ে চলে গেছে সেদিকে মাছটির চলে যাবার রেখা বা দাগ অঙ্কিত হয়ে আছে। মুসা নবী তাঁর ভাইকে বললেন তুমি তোমার গন্তব্যে চলে যাও আর আমি আমার পথে যাই।

মুসা নবী সেই দিকনির্দেশা মত যাবার পর দেখতে পেলেন যে, আবাদান হাতে একটি লাঠি এবং সমস্ত শরীর কাপড়ের আবৃত্তে ঢাকা নয় এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এ বিষয়টা কোরানে এভাবে উল্লেখ নেই এটা আসলে ভাববাদী ব্যবস্থায় শোনা যে, আবাদান একটি আশা বা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবাদান বললেন আপনি মুসা ? মুসা কালিমুল্লাহ্ বলালেন, হ্যাঁ। আবাদান আবার জিজ্ঞাসা করলেন আপনি আমার জ্ঞানের পরিমাপ জানতে এসেছেন কিন্তু আপনিতো ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না! মুসা কালিমুল্লাহ্ বললেন আল্লাহ্ যদি আমার সহায় হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে ধৈর্যশীল হিসাবে পাবেন। তখন আবাদান বললেন আপনার সাথে আমার চুক্তি হলো আপনি যদি তিন বার ধৈর্যের ত্রুটি ঘটান, তাহলে আপনার রাস্তায় আপনি এবং আমার রাস্তায় আমি। একথা শুনে মুসা কালিমুল্লাহ্ একটু বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন এই কারণে যে, যার জ্ঞানের তারতম্য পরিমাপ করবো, বুঝবো, জানবো সেই নিয়তেই তো এখানে এসছি কিন্তু আবাদান প্রথমেই শর্ত দেয় যে তিন বার যদি ধৈর্যের ত্রুটি ঘটে তাহলে আপনার রাস্তায় আপনি আর আমার রাস্তায় আমি। মুসা কালিমুল্লাহ্ আবাদানের সঙ্গে কথোপকথনে শর্ত মেনে নিয়ে তাঁরা লোকালয়ের দিকে যাত্রা করলেন।

যাত্রার প্রারম্ভেই যেতে যেতে একটা নদী পার হতে হবে। নদীর ঘাটে মুসা কালিমুল্লাহ্কে দেখে মাঝি (মুসা আঃ উম্মত) খুবই খুশি বা আনন্দিত এই ভাবনাতে যে আমার রাসুল বা আমার নবী আজকে আমার এই নৌকাতে উঠে পার হবেন এর চেয়ে আনন্দময় ক্ষণ আর কি আছে ? অর্থাৎ একটি যুগে যখন নবী বা রাসুলের আগমন ঘটে তখন তাঁর বহিঃপ্রকাশ বা তাঁর কাছে যারা শিষ্যত্ব গ্রহন করে তখন তাঁর নীতি, আদর্শ বা ধর্মীয় আঙ্গিক যারা মেনে নেয় তারা উম্মত হয়ে যায়। ঐ নৌকার মাঝি ছিলো মুসা নবীর উম্মত। মুসা কালিমুল্লাহ্র

সঙ্গে আবাদান ছিলেন তাঁকে তো মাঝি চিনে না। মুসা নবী আবাদানকে বললেন হুজুর আপনি আসুন বা উঠুন। তখন ঐ নৌকায় তাঁরা উঠলেন এবং যিনি নৌকার মাঝি সে তো মুসা কালিমুল্লাহ্‌রই ভক্ত। মাঝি নৌকা ছেড়ে দিলেন এবং নদী পাড় হতে লাগলেন। যেতে যেতে নৌকাটি যখন কিনারার কিছুটা দূরে তখন মুসা (আঃ) নবীর উম্মত বললেন যে, হুজুর আমি এই নৌকাটা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি এবং এটা থেকেই আমি এবং আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চাহিদা মিটিয়ে থাকি। আমাকে একটু দোয়া করে দিন, আমি যেন এটার অবলম্বনে সুন্দর ভাবে চলতে পারি। তখন মুসা কালিমুল্লাহ্ আবাদানের দিকে চেয়ে বলেন, হুজুর আপনিই একটু দোয়া করে দিন। আবাদান বললেন দোয়া করে দিব ? মুসা (আঃ) বললেন হ্যাঁ। তখন আবাদান লাঠি দিয়ে নৌকার তলা ফুটো করে দিলেন এবং নৌকায় পানি উঠতে উঠতে তারা কিনারায় পৌঁছালো। সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হতেই নৌকাটি পানিতে ভরে ডুবে গেল।

এই ঘটনাটি দেখে মুসা কালিমুল্লাহ্‌র মনে প্রশ্নের উদয় হলো যে, এই কাজটা একজন ভাল মানুষ করতে পারে না, তাঁর কাছ থেকে আমি কি জ্ঞান শিখবো! এই ধরনের জালিমকৃত জ্ঞান যে, যার নৌকায় পাড় হলাম তাকে টাকা কড়ি দেবার বালাই তো নাই-ই আবার উল্টো তার নৌকাটাই ফুটো করে ডুবিয়ে দিল। এটা কোন ধরনের জ্ঞান ? নিশ্চয়ই এটা জালিমদের জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। মুসা কালিমুল্লাহ্ ভাবেন যে, আমার তো শর্ত হলো তিনবার ধৈর্যের ত্রুটি ঘটলে তাঁর রাস্তা তাঁর আর আমার রাস্তা আমার। তাই একবার অন্তত জেনে দেখি এর কারণ বা ব্যাখ্যাটা কি ? তখন মুসা কালিমুল্লাহ্ আবাদানের কাছে জানতে চায় যে, আমার উম্মত যার নৌকায় পাড় হলাম সে দোয়া চাইল তার পরিবর্তে আপনি তার নৌকাটি ফুটো করে ডুবিয়ে দিলেন, যা দিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করে। হুজুর আপনি এটা কেন করলেন ? তখন আবাদান বললেন আপনি কিন্তু একবার ধৈর্যের ত্রুটি ঘটিয়ে ফেললেন আর দুইটি বার ঘটালে আপনার পথে আপনি আর আমার পথে আমি। তখন মুসা কালিমুল্লাহ্ ভাবলেন যে, এ কেমন ধরনের মানুষের পাল্লায় পরলাম। জানতে চাইলেই কিছু বলে না শুধু শর্ত ভঙ্গ করার বিষয়টাই বলেন যে, আপনি কিন্তু একবার শর্ত ভঙ্গ করলেন।

অতঃপর সেখান থেকে যেতে যেতে লোকালয়ের মধ্যে চলে গেলেন এবং সেখানে কিছু বালক মাঠের মধ্যে খেলা করছিল এমন অবস্থায় আবাদান মুসার (আঃ) দিকে দৃষ্টি দেয়। আবাদান দেখতে পেলেন মুসা (আঃ) রেগে আছে কারণ প্রথমবার ধৈর্যহারা হবার পর ঐ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা পান নি। এরপর আবাদান মাঠের মধ্য থেকে একটি বালককে ধরে এনে উঁচু করে আছাড় দিয়ে সেই বালকটিকে মেরে ফেলেন। এটা দেখে মুসা কালিমুল্লাহ্ রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে যে, এ কাজও কি একটি ভাল মানুষের দ্বারা সম্ভব ? যিঁনি একটি ছোট বাচ্চা বা বালককে আছাড় দিয়ে মেরে ফেললেন ? তাঁর কাছে আমি জ্ঞানের কি শিখবো! তাই এই ফায়াসালাটা আমি নিতে চাই। আবাদানকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনাকে এই বিদ্যা কে শিখিয়েছে ? নিশ্চয় এটা কোন ভাল বিদ্যা নয়। আবাদান বললেন, আপনি কিন্তু দুইবার ধৈর্যের ত্রুটি ঘটালেন।

তারপর ঐ স্থান থেকে আবার সামনের দিকে রওনা দিলেন। মুসা কালিমুল্লাহ্ একটু বিব্রতকর অবস্থা বোধ করলেন। কারণ তাঁর এই কার্যগুলোর দিকনির্দেশনা সে ভেঙ্গে দেয় না বা বলে না। শুধু শর্ত ভঙ্গের কথা বলে যে আপনার কিন্তু দুই বার ধৈর্যের ত্রুটি হলো। মুসা কালিমুল্লাহ্র চিন্তা হলো যে, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে যেহেতু আমি আবাদানের সাথে এসেছি, তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটাই দেখবার বিষয়। কারণ আবাদানের এই সকল কর্মকান্ডের ভাবধারাটা কি সেটা তো আমাকে বুঝতে হবে! তাই আবাদানের পিছনে মুসা কালিমুল্লাহ্ যায় আর ভাবে কিন্তু মুসার (আঃ) শরীরে এত বেশি ক্রোধ বা রাগান্বিত হয়েছেন যে নিজিকে কন্ট্রোল করা দায়। তাঁরা যেতে যেতে যখন গঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো। তখন একটা বাড়িতে হাক ছেড়ে বললেন যে, আমরা দুইজন মুসাফির এসেছি আমরা একটু পিপাসায় কাতর হয়েছি তাই একটু পানি পান করতে চাচ্ছি। সেই বাড়ির ব্যক্তি বললেন পানি-টানি দেওয়া যাবে না আপনারা বিদায় হউন। অর্থাৎ ঝাড়ি মেরে তাদেরকে বের করে দিলেন। এ কথা শুনে বের হয়ে আসতেই তাঁরা দেখতে পেলেন যে, ঐ বাড়ীর পাশে একটি প্রাচীর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রাচীরটি এমন সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হচ্ছে। তখন আবাদান প্রাচীরের দিকে বার বার দৃষ্টিগোচর করেন এবং মুসা কালিমুল্লাহ্কে বলেন এই প্রাচীরটা আমাদের দু'জনকে মেরামত বা ঠিক করতে হবে। তাই তুমি কোন কাজটা করবে ? হয় তুমি কাজে লিপ্ত হও আমি সহযোগিতা করি আর না হয় আমি কাজে লিপ্ত হই তুমি সহযোগিতা কর।

মুসা কালিমুল্লাহ্ এবার আরও বেশি ক্রুদ্ধ হলেন। কারণ আগে থেকেই আবাদানের দুটি কর্মের পিছনে তাঁর রাগ ছিল, আর এখন যে বাড়িতে পানি চেয়ে পানি পাওয়া গেল না সেই বাড়ীর প্রাচীর ঠিক করতে হবে ? আবাদানের সঙ্গে যেহেতু মুসা কালিমুল্লাহ্ আছেন তাই তাঁর কথা অস্বীকার না করে সম্মতি জানিয়ে প্রাচীরটি ঠিক করবার কাজে লেগে পরলেন। মুসা কালিমুল্লাহ্ প্রাচীর ঠিক করছেন আর ভাবছেন এর সঙ্গে আমি আর থাকবো না। তাই তৃতীয় বার মুসা কালিমুল্লাহ্ ধৈর্যহারা হয়ে আবাদানের কাছে বললেন যে, আমি যেহেতু শর্ত রাখতে পারিনি যার জন্য আপনার রাস্তায় আপনি যাবেন এবং আমার রাস্তায় আমি কিন্তু যাবার আগে আপনার এই সকল কর্মেকান্ডের ব্যাখ্যাগুলো জানতে চাই। তখন আবাদান বললেন:- প্রথমত হলো আমরা নৌকাযোগে যে নদীটা পাড় হই, সেই নদীটা হলো জালুত নামের এক রাজার রাজ্য সীমার ভিতরে। সেই রাজা হলো বদমেজাজি। তার রাজ্যের এরিয়াতে বা এলাকাতে যত নতুন নৌকা হয়, তার রাজ দরবার হতে নৌকার বহর আসলে ঘাটে যার নতুন নৌকা দেখবে তারই নৌকা রাজ বহরের সঙ্গে যোগ করে নিয়ে নেন। ধনী বা গরীবের বাছ বিচার করেন না। সেই জালুত রাজার বহর এই নদী দিয়েই সেদিন আসতেছিলো। (অর্থাৎ তিঁনি (আবাদান) দেখতে পেলেন যে, আমরা নৌকা থেকে নেমে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সেই রাজ বহর আসবে আর আসলেই রাজ্য সৈন্যরা তার নৌকাটা নিয়ে নিবে যদি নৌকা নতুন বা ভাল থাকে)। তাই আমি লাঠির আঘাতে নৌকাটাকে ফুটো করে দেই। কারণ তারা ফুটো নৌকা নিবে না। ঐ রাজ বহর চলে যাবার পর আপনার ভক্ত হয়ত অল্প কিছু টাকা কড়ি দিয়ে নৌকাটি ঠিক করতে পারবে কিন্তু যদি নৌকাটাই নিয়ে নেয় তাহলে আপনার ভক্তের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়বে, তার সংসারে অভাব অনটন এসে যাবে। তাই আপনি আমাকে যখন বললেল, হুজুর আপনি দোয়া করে দিন। তাই আমি লাঠির আঘাতে নৌকাটাকে ফুটো করে পানিতে ডুবিয়ে দেই। তাহলে আমি এই কাজটি করে তার ক্ষতি করেছি না কি ঠিক কাজটাই করেছি ? মুসা কালিমুল্লাহ্ ব্যাখ্যাটি জানার পর বললেন আপনি উত্তম কাজ করেছেন।

দ্বিতীয় হলো:- মাঠের মধ্যে যে বালকগুলো খেলা করছিল তার মধ্য হইতে যে বালকটিকে আমি আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছি, সেই বালকটি বড় হলে জালিম -

হবে। কিন্তু তার বাবা-মা উভয়ই মুমিন মুমেনাত। তাই তাদের সেই মুমিনত্ত্বের ধারাকে খন্ডন করতে করতে এই বালকটি তার বাবা-মা কেউও সে জালিমের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই এই বালকটিকে আমি শেষ করে মালিকের কাছে সুপারিশ করেছি যে, তাদের ঘরে যেন একটি নেক সন্তান দান করেন। তাহলে আপনিই বলুন এই কাজটি করে আমি কি ভাল করি নি ? তখন মুসা কালিমুল্লাহ্ বললেন, হুজুর আপনি উত্তম কাজ করেছেন।

তৃতীয় হলো:- যে বাড়ীতে গিয়ে আমরা পানি না পেয়ে প্রাচীরটা ঠিক করলাম। এই প্রাচীরটা ঠিক বা মেরামত করবার কারণ হলো, এই বাড়ীতে দু'জন এতিম রয়েছে। এই এতিমদের যে আমানত সেই আমানতটা এই প্রাচীরের নিচে রাখা রয়েছে। (অর্থাৎ যে রকম আগের যুগে মানুষ মাটির নিচে গর্ত করে গুপ্তধন রাখত ঠিক তেমনই এই প্রচীর নিচে তাদের আমানত রাখা ছিল)। আবাদান বললেন, আমি দেখতে পেলাম প্রাচীরটা এভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এভাবে প্রচীরটা বিলুপ্ত হয়ে গেলে গুপ্তধন বা আমানতকৃত এতিমদের হক অন্য কারো হাতে চলে যেতে পারে। কারণ এই এতিম বাচ্চাদ্বয় বড় হতে কয়েক বছর সময় লাগবে। তাই আমরা প্রাচীরটা মেরামত করলাম যাতে এই আমানকৃত হক থেকে তারা বঞ্চিত না হয় বা অন্য কেউ না পায়। যার জন্য এটা মেরামত করেছি যাতে তারা বড় হওয়া পর্যন্ত প্রাচীরটি অক্ষত থাকে এবং তাদের হক তারা বুঝে নিতে পারে। তাই আমরা দুজন মিলে এই কাজ সম্পন্ন করেছি। তাহলে এই কাজটা আমরা ভাল করেছি, না কি মন্দ করেছি ? এবার মুসা কালিমুল্লাহ্ বলেন হুজুর আপনি উত্তম করেছেন। তিনটি কাজই আপনি উত্তম করেছেন। মুসা (আঃ) নবী হবার পরেও এই ভাবধারা সম্পর্কে তিঁনি বুঝতে পারেননি।

তাহলে আবাদান কোন জ্ঞানের জ্ঞানী ছিলেন ? যে জ্ঞানের দ্বারা এই ঘটনা প্রবাহ পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং জানতে পেরেছেন! সেই ভাবধারার যে জ্ঞান, যে বহিঃপ্রকাশ, সেটার কার্যকারিতার যে রূপ, সেই ধারাবাহিকতাই হলো এই আধ্যাত্মিক একটি প্রণালীতে। এবার মুসা কালিমুল্লাহ্ বলেন হুজুর! আবাদান বলেন না, আপনি আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তাই আপনার রাস্তায় আপনি গমন করেন আর আমার রাস্তায় আমি চললাম।

এজন্য মুস্তাকিমের পথ বা যারা জাগতিক ভাবে এই সমস্ত পথকে অবলোকন করে পরিচালিত হয় তাদের ভাবধারা হয়ত সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হয় না। যার জন্য ভ্রান্তির দিকে পড়ে যায়, তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আসলে এই উল্লেখিত ব্যবস্থা, যদিও ঘটনাটা কোরানুল মাজিদের সূরা কাহাফের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। তাই এই ঘটনার অবতারণা করা হলো এই মুস্তাকিমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হবার জন্য। জগত সংসারে অনেক মানুষই রয়েছে যেটা রাসুলপাক (সাঃ) (আঃ) বর্ণনা করেছেন যে :- "কিয়ামতকাল পর্যন্ত এক শ্রেণীর মানুষ থাকবে যারা আমার হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদেরকে কেউ কোন ভাবেই হক থেকে বিচ্যুতি ঘটাতে পারবে না। তাই সেই দলটাই হলো এই মুস্তাকিমের দল। তাঁরা জগত সংসারে কোথাও না কোথাও তাদের নিয়োজিত কার্যের মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে। এজন্য আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। আমাদেরকে মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত কর, আমরা বলে থাকি কিন্তু মূলধারা হলো:- আলা সিরাতিম মুস্তাকিম্। অর্থ:- আমাদেরকে মুস্তাকিমের (সত্য সঠিক) পথে পরিচালনা করুন। তাহলে এটা হলো ফরিয়াদ কিন্তু আলোচ্য সূরাটিতে এই মুস্তাকিমের দিশা সম্পর্কে অর্থাৎ সেই পথে ধাবিত হবার জন্যই নির্দেশ করছেন।

আল্লাহ্‌র রহিম নাম বা লকব

পঞ্চম আয়াতে বলা হলো:- তান্‌জিলাল্ আজিজুর রহিম। অর্থ:- ইহা প্রবল ক্ষমতাবান রহিম হইতে নাজেল। আজিজ শব্দটি প্রবল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ হলো আল্লাহ্‌ই একমাত্র ক্ষমতাবান। আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তৌহিদে বাস করে। সুতরাং একমাত্র ক্ষমতাবান আল্লাহ্। যদিও মানুষ এবং জ্বীনকে একটি নির্দিষ্ট সময় সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করা হয়েছে। এর বাইরে কাহারও কোন প্রকার ক্ষমতা নেই। সর্বোচ্চ পর্যায়ে দর্শন করলে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই। অতি ক্ষুদ্র একটি ধূলিকণাও বলবার উপায় নেই আল্লাহ্ হতে সে সম্পূর্ণ আলাদা। ধূলিকণাটি যতই ক্ষুদ্রই হোক না কেন, এই ক্ষমতা পেলে অতি ক্ষুদ্রতম ধুলিকণাটিও শেরেক করিত। বলিত আল্লাহ্ আপনি যত বড়ই হউন না কেন, আপনার মত আপনি আর আমি যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, আমার মত আমি। তাহলে শেরেক হত। আল্লাহ্‌র অংশীদারিত্বের বিষয়ে ঘোষণা থাকতো না।

এজন্য বলা হয় "লা শরীক-আলা" নাই কোন শরীক আল্লাহ্ ছাড়া। আপন নফ্সের সঙ্গে মোহ-মায়ার খান্নাসটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই খান্নাসই মানবজাতিকে অনেক রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে শেরেকের পথে নিয়ে যায় তথা অংশীদারিত্বের পথে নিয়ে যায়। এজন্য জাগতিক ভাবে শেরেক কবিরা (গুনাহ)। দুই এর মাঝে তৌহিদ থাকে না, এক এর মাঝে শেরেক থাকে না। সুতরাং কোরান দর্শন (ফিলোসফি) খান্নাস যুক্ত দুনিয়ার বুনিয়াদের উপর বলা হয় নি। তৌহিদের পথে কেমন করে আসা যায় তার ভিত্তিটি হলো কোরানুল হাকিম। সিরাতাল মুস্তাকিমের যে বুনিয়াদ উহাতে খান্নাসযুক্ত মোহ-মায়ার দুনিয়াটি থাকতে পারে না। তাই এখানে রহিম রূপি আল্লাহ্র কথা বলা হয়েছে। রহিম রূপটি আল্লাহ্র বিশেষ দান।

বান্দা জন্ম লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে সে কি খাবে, কি করবে ? সকল কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে রহ্মানের দানে কিন্তু রহিমের দানটা হলো বিশেষ। এই বিশেষ দানের কারণ হলো:- আল্লাহ্পাক যদি কোন বান্দাকে ক্ষমা করে দেন এই ক্ষমার পরের দানটি হলো রহিম রূপে। অর্থাৎ এই ক্ষমার লকবটাই হলো রহিম রূপে। এজন্য সগ্রহ কোরানুল মাজিদের কোথাও গাফুরুর রহ্মান নেই, আছে হলো গাফুরুর রহিম। ক্ষমা প্রাপ্তির একটি সনদ। সেখানে মন্দের কোন লেস নেই, পরিপূর্ণ একটি সনদ। সেটাই রহিম রূপের অবয়বে প্রকাশ করা হয়েছে। বান্দার তার কৃতকর্ম বা মোরাকাবা মোশাহদা দ্বারা যদি সে ক্ষমার ধারাতে সমাসীন হয় এবং আল্লাহ্ যদি তাকে ক্ষমা করে, এই ক্ষমার রূপটাই হলো রহিমের। তাই রহিম রূপের ক্ষমার স্তর থেকে যদি আমরা শুরু করি যেমন, আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা, আরাধনা, মিনতি, যে সুর, যে চাওয়া সেটাকে বার বার উপস্থাপন করছি, সেই উপস্থাপন যখন গৃহিত হবে, সেই গৃহিত রূপ রেখাই হলো এই রহিম।

তাই রহ্মান এবং রহিম এই দুই দানের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এই বিষয়টা সবার চোখে ধরা পড়ে না। আর ধরা না পড়বারই কথা, কারণ এগুলো জানবার পরেও অনেকেই তো ধ্যান সাধনার (মোরাকাবা মোশাহেদা) মাধ্যমে খান্নাসমুক্ত তৌহিদ বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করা জীবন দর্শনটিকে গ্রহন করার মানসে এগিয়ে আসে না। এই আসেনা বা পারেনা এই না আসাটাই তকদির। এই না পারাটাই আল্লাহ্র লীলাখেলা। এই না পারার জন্যই দুনিয়ার -

বুকে যত অনিয়ম, উচ্ছশৃঙ্খলা, শঠতা, ধোঁকাবাজি, হীন স্বার্থ উদ্ধারের মত্ততা, হিংস্র প্রতিযোগিতা, আস্ফালনের কুৎসিত অহংকার ইত্যাদি বিষয়গুলো আছে বলেই এত আয়োজন। ইট ইস সায়েন্স বিয়ন্ড সায়েন্স, বিজ্ঞান বহির্ভূত আরও একটি বিজ্ঞান ধ্রুব সত্য রূপে স্থান করে আছে।

মূল ধারার আলোচনায় প্রথমে ১) ইয়াছিন ২) ওয়াল্ কুরআনুল্ হাকিম্ ৩) ইন্না কালা মিনাল্ মুর্ছালিন্ ৪) আলা সিরাতিম মুস্তাকিম্ ৫) তান্জিলাল্ আজিজুর রহিম। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যখন আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, তখন থেকে ৫টি স্তর বা ধাপে ধাপে উচ্চতার অবগাহন হলে "ইয়াছিন"। এজন্য কোন এক সাধক তার রচনাতে উল্লেখ করেছেনঃ- নিরানব্বই নামের মাঝে ফুল ফুটিল ইয়াছিন, তক্তে বসা রাব্বুল আলামিন।

হেদায়েতের বাণী গ্রহন করা বা না করা

এর পরে ৬ষ্ঠ আয়াতে আসলো হলোঃ- লিতুন্জিরা কাওয়াম্ মা উন্জিরা আবায়ুহুম্ ফাহুম্ গাফিলুন্। অর্থঃ- তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে এই হেদায়েতের বাণী পৌঁছানো হয়েছিল কিন্তু তারা গাফেল। আল্লাহ্পাক প্রতিটি জাতি বা কওমের নিকট সতর্ককারী রূপে রাসুলদেরকে পথ পদর্শনের জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। এই কথাটির উপর ভিত্তি করে অনেকেই কোরানের মাঝে আত্ম বিরোধী কথা অস্বীকার করতে চায় কিন্তু ইহা মোটেও আত্ম বিরোধী নয়। কারণ প্রতিটি কওম বা জাতির জন্য আল্লাহ্পাক রাসুলদেরকে তাদের সঠিক পথ দেখাবার জন্য পাঠিয়ে থাকেন, এই কথাটি যেমন সত্য তেমনি আবার ইহাও একটি সত্য কথা যে, যদি কোন কওমের বা জাতির জন্য একান্তই রাসুল পাঠানো না হয়ে থাকে তাহলে তাদের উপর অজ্ঞতার অন্ধকার তাদের উপর থেকে যায়। এই অজ্ঞতার অন্ধকারে অবস্থান করার দরুন সেই জাতি মানুষের রূপে অনেকটা পশুরতুল্য তথা জীব-জানোয়ারের মত। প্রশ্ন হলো যদি সত্যিই কোন কওম বা জাতির জন্য রাসুল আল্লাহ্পাক না পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের বিচার ব্যবস্থা থাকে না। তাই আল্লাহ্পাক প্রত্যেক জাতির জন্য তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন।

যেহেতু তরিকতে আহলে বায়াতের ভাবধারাতেই ভাববাদী ব্যবস্থার আলোচনা রাখছি, তাহলে এই আলোচনার উৎস হলো হেদায়েতের বাণী। প্রত্যেক যুগে-

যুগে, কালে-কালে নবী-রাসুল থেকে শুরু করে আল্লাহ্‌র যত প্রতিনিধিগণ এসেছেন, সবাই এই মূল ধারা সম্পর্কে আহ্বান করেছেন বা দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু যারা গাফেল, তারা এটা গ্রহন করে নি বরং এটা থেকে পিছু পা হয়েছে। এই দিকে নিজেদের দস্তাবেদ বা নাম লেখান নি। তারা এই হেদায়েতের রাস্তাতে কার্যকারিতা করে নি। ৬ষ্ঠ ধাপে তারা গাফেল ছিল। অর্থাৎ তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে বা তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে মূলধারার কথা গুলো জানানো হয়েছে বা বোঝানো হয়েছে কিন্তু তারা কেউ গ্রহন করে নি, তারা গাফেল।

কোরানুল মাজিদের অপর একটি সূরা, সূরা কাহাফে ১৭ নাম্বার আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন যে:- ওয়ামান ইউদলিল ফালান তাজিদালাহুম ওলিয়াম মুর্শিদা। অর্থ:- তুমি পাইবে না তাদের জন্য কোন ওলি বা মোর্শেদ যারা পথভ্রষ্ঠ। তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে হেদায়েতের বাণী ওয়াকিবহাল করা হয়েছে কিন্তু তারা সবাই গাফেল, হেদায়েত নেই। তাহলে হেদায়েত গ্রহন করবার পরেই উচ্চ ধারাতে উত্তরণ হতে হতে এই ইয়াছিনের পরিপূর্ণতার ফল দাঁড়ায়। তাই এই হেদায়েত নামক ব্যবস্থা হতেই সূচনা করতে হবে। সুতরাং প্রথমেই এই হেদায়েত খাতায় নামটা লিপিবদ্ধ করতে হবে বা হেদায়েত গ্রহন করতে হবে। অতঃপর সেই আমল নীতির দ্বারা রহিমের ক্ষমার প্রাপ্ততা সুনিশ্চিত করতে হবে। অতঃপর ক্ষমা থেকে উত্তরণ হয়ে মুস্তাকিমে আসতে হবে এবং মুস্তাকিম থেকে মুরসালিনে যেতে হবে, অতঃপর মুরসালিন থেকে কুরআনুল হাকিমে যেতে হবে আর হাকিম থেকে ইয়াসিনে পৌঁছাতে হবে। তাহলে এই পথের যে সূচনা, সেই সূচনা হলো গুরু। কারণ আমরা যারা মহান স্রষ্টাকে বিশ্বাস করি তারা সবাই মহান স্রষ্টাকে চাই। স্রষ্টা থেকে সৃষ্টির প্রকাশ আর বিকাশ। তাহলে এই প্রকাশ আর বিকাশকে সমন্বয় সাধন করবো কি দিয়ে ? তাঁকে তো পাওয়া যায় না। তাই স্রষ্টাকে লাভ করার যে প্রক্রিয়া বা কারিকুলাম সেটাই আল্লাহ্‌পাক তাঁর কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁকে পেতে হলে তাঁর প্রতিনিধিকে অনুসরণ করবার কথা বলা হয়েছে বা একটি মাধ্যম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে লাভ করবার কথা বলা হয়েছে। উছিলা ধরতেই হবে, একা একা আল্লাহ্‌কে লাভ করা যায় না। যুগে-যুগে, কালে-কালে যত ওলি আওলিয়াগণ এসেছেন তাঁরা সবাই গুরু মাধ্যম বা উছিলার মাধ্যমেই স্রষ্টাকে লাভ করেছেন।

আল্লাহ্ বলেনঃ- আমাকে পেতে চাইলে আমার হাবিবকে অনুসরণ কর আর আল্লাহ্র হাবিব বললেনঃ- আমাকে পেতে চাইলে আমার আহলে বায়াতকে অনুসরণ কর। এটাই এই আহলে বায়াত বা গুরুবাদী ভাবধারায় স্থানান্তরিত হয়েছে। যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সকল কার্যক্রমগুলো তরান্বিত করতে চেষ্টা করি। তাই মূল ধারার ভাবধারাকে বুঝতে হলে বা এটাকে সন্নিবেশিত করতে হলে এটা ভাষার শৈলীতে আসলে প্রকাশ করা যায় না। যে কারণে সাধকগণ এভাবেও বলে থাকেন যেঃ- "কালাম বাণী জিব্রাঈল আনিতেছে হরদম" মূল বিষয় জিব্রাঈল তার এই কার্যাবলীতে সমাসীন রয়েছে। এজন্য কোরান নাজেল (বর্তমান) হয়ে থাকে। তাহলে সেই ভাবধারাগুলো এখনও চলমান প্রক্রিয়াতে রয়েছে। এটা সাধকদের রাস্তায় বলা হয়, সেখানেই মূল ধারার পরিপূর্ণতার উদ্ভাসন রয়েছে। শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) বলেছেনঃ- "সাধকের নিকট নিজ ভাষায় যাহা অহি হইয়া আসে তাহাই তাঁহার কোরান"। তাই যাই কিছু বলা হোক দুনিয়ার আপেক্ষিকতার যে রঙ, রূপ, শৈলী, কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে সেটাও যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয়। তার মধ্য হতেই আমাদেরকে মূল ধারার কথাগুলো বলে যেতে হবে এবং সেই ভাবধারাতে আমল নীতিগুলো পরিচালনা করতে হবে। যা এমন একটি প্রক্রিয়া শৈলীতে যেন কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না লাগে। সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সত্য, সঠিক, সুপথ এবং মূলধারা বুঝবার তৌফিক মওলা সবাইকে দান করুক। আমিন।

কোরান সম্পর্কে কিছু কথা

শুরুতেই আমার মহান মোর্শেদ ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরীর লিখিত কোরানুল মাজিদ হুবহু অনুবাদ এবং কিছু ব্যাখ্যা প্রচলিত অনুবাদ এবং তাফসীর এর সাথে তুলনা করলে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে সঠিক মানদন্ড জরুরী বলে মনে করি। কিতাবখানি অধ্যায়নের জন্য পাঠকদের সবিনয় অনুরোধ রাখলাম। বর্তমান কম্পিউটার গণিত, বিজ্ঞান এবং মেডিটেশন সাক্ষ্যতা বহন করে চলেছে কোরানুল মাজিদ আল্লাহ্‌র বাণী। দুনিয়াতে যখনই কোন পয়গাম্বর প্রকাশিত ভাবধারায় আল্লাহ্‌পাকের বাণী দুনিয়াবাসীকে জানান দেন, তখন এ বাণীর সত্যতার জন্য প্রমাণ দাবী করা হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী। এরূপ আখেরী পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) যখন স্বীয় মাবুদের একত্ত্ববাদ এবং স্বীয় রিসালাতের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছানো শুরু করেন তখনই প্রমাণ স্বরূপ যুক্তি উপস্থাপন শুরু করে। যেমন সূরা আনকাবুত-এর ৫০ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে:- "এবং লোকে বলে- তাঁহার ওপর তাঁহার রব হইতে (অলৌকিক) নিদর্শনাবলী নাজেল কেন হয় না ? বলিয়া দিন নিদর্শন সমূহ তো আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী"। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আয়াতে কারিমাটি উল্লেখ্য রাখলাম। অতঃপর লোকেরা রাসুলের (সাঃ) (আঃ) নিকট বলল যে, আপনি আসমান পর্যন্ত সিঁড়ি লাগান এবং আমাদের সামনে এর উপরে আরোহন করে আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ নিয়ে আসুন, তখন আমরা ঈমান আনব।

এখন বুঝবার বড় বিষয় হলো আল্লাহ্‌র কালামপাক রাসুলের (সাঃ) (আঃ) পাক জবান থেকে প্রকাশ ফেরেশতা জিব্রাঈল মাধ্যম যোগে কিন্তু বিষয় সমূহ সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা না থাকায় এমন মন্তব্য। কারণ এ বিষয় সম্পর্কে বুঝতে হলে আধ্যাত্মিক সাধনা বা মোরাকাবা মোশাহেদায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু মানুষ গাফেল হবার কারণে বা আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে নিরুৎসাহিত হবার কারণে পয়গাম্বর গণের আবির্ভাব। আল্লাহ্‌পাক কোরানুল মাজিদের সূরা আনকাবুতের ৫১ নাম্বার আয়াতে বলেন :- (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

"ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট নয় আমরা আপনার উপর আল-কেতাব নাজেল করিয়াছি যাহা তাহাদের উপর তেলোয়াত হয় ? নিশ্চয় উহাতে অবশ্য একটি রহমত ও সংযোগ রহিয়াছে বিশ্বাসকারী একটি কওমের জন্য"। তাই চিন্তাশীল এবং বিশ্বাসীগণ তাদের জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষা অন্তে পয়গাম্বরগণের নিকট বিশ্বাস স্থাপন করে দ্বীন গ্রহন করেছে। রাসুল (সাঃ) (আঃ) কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র হতে শিক্ষা গ্রহন করে নি। এজন্য এই মহান কিতাব তাঁহার পক্ষে রচনা অসম্ভব বটে (জাগতিক)। কারণ জাগতিক বিষয়ে আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণা থাকে না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সূরা আনকাবুতে, ৪৮ নাম্বার আয়াতে জানান দেওয়া হয়েছে যে :- "ইতিপূর্বে আপনি কোন কিতাব তিলোয়াত করেন নাই এবং আপনার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহা লিপিবদ্ধ করেন নাই' সেই রূপ করিলে বাতিল ব্যক্তিরা সন্দেহ করিত"। প্রচলিত ভাবধারায় রাসুল (সাঃ) (আঃ) লেখাপড়া শিখতেন, পূর্ববর্তী জ্ঞানী কিতাব অধ্যায়ন পূর্বক নিজের জ্ঞান বিকাশের সুষ্ঠ ধারায় তা লিপিবদ্ধ করতেন কিন্তু তা নয়। কারণ হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে তিঁনি নিজের থেকেও একটি কথাও বলেন না, যত সময় না পত্যাদৃষ্ট হয়। এটাই আধ্যাত্মিক প্রণালী। যেমন বিষয়টি সম্পর্কে কোরানুল মাজিদের ভাবধারা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন (সূরা বাকারা, আয়াত নাম্বার ২৩ হতে ২৮ দ্রষ্টব্য)। ইহা আল্লাহ্‌র কালাম যা অস্বীকার কারীদের চ্যালেঞ্জ করছেন:- তোমরা পূর্ণ কোরানুল মাজিদ কিংবা কমপক্ষে একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আসো, যদি তা ও না পারো তবে একটি আয়াত (অনুরূপ) তৈরী করে নিয়ে আসো, কিন্তু পৃথিবীতে তারা সে বিষয়ে অক্ষম কারণ ইহা আল্লাহ্‌র কালাম। আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ্‌ চ্যালেঞ্জ করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান জ্ঞান গবেষণার উন্মুক্ত ধারাতে বার বার প্রমাণিত হয়েছে ইহা একটি ঐশী কিতাব এবং স্থায়ী মোজেজা স্বরূপ। দুনিয়াতে অনেক অমুসলিম পন্ডিত ব্যক্তিগণও এ কিতাব সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দু-একজনের উদাহরণ তুলে ধরা হলো, যেমন পাদ্রী বাসভার্থ বলেন:- নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরানুল হাকীম বর্ণনা, বীরত্ব ও সত্যবাদীতার এক বিরাট মোজেজা। ইংরেজ এ. জে. বেরী লিখেন :- কোরানুল মাজিদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমার স্বর মাধুর্যের আনন্দ এবং হৃদয়ের কম্পন শ্রবণ করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানের জ্ঞান গবেষণায় পৃথিবীর আনুমানিক বয়স ধরা হয় ছয় হাজার কোটি বছর।

জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয় পানি থেকে সূচনা আরও অনেক রয়েছে যেমন :- প্রথম প্রাণী ডাইনোসর উল্লেখ করা হয় অথচ আল্লাহ্পাক তাঁর কালামে সুস্পষ্ট ভাবে সূরা ইয়াসিনের ৩৬ নাম্বার আয়াতে জানিয়ে দিলেন :- "যিনি মহিমান্বিত (তিঁনি) সৃষ্টি করিয়াছেন সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় যাহা জন্মায় জমিতে এবং তাহাদের নফ্স সমূহ (রুহ বলা হয় নাই) হইতে এবং যাহা তাহারা জানে না"। তাই মহান স্রষ্টার সৃষ্টি যে বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞানময় তা সুস্পষ্ট হিসাবে বা প্রমাণ হিসাবে উল্লেখিত। যা নিয়ে গবেষণা এখনও চলমান। পৃথিবী বাসীর জন্য এই কালাম সর্বপরি দৃষ্টান্ত রেখেছে বিজ্ঞানের আবিষ্কার এটা বার বার প্রমাণ করে চলেছে।

কোরানুল মাজিদের মোজেজা বুঝবার জন্য আরবি ভাষা জানা জরুরী নয়। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ এই মোজেজাকে দেখার জন্য পদ্ধতিগত চোখ রাখবে। কালামপাকের ধারা অহি নাজিলের ধারাবাহিকতায় নয় বরং বর্ণনা অনুযায়ী করা হয়েছে। রাসুল (সাঃ) (আঃ) হায়াতে তাইয়েবায় এ ধারা বর্ণনা করেছেন। কোরানুল মাজিদের আয়াত প্রয়োজন অনুসারে নাজিল হতে থাকে। প্রথম অহি হেরা গুহায় রমজানের ২৬ তারিখ (দিবাগত রাত্রে) যখন জিব্রাঈল (আঃ) সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন। রাসুল (সাঃ) (আঃ) এ অস্বাভাবিক ঘটনায় পেরেশান হয়ে ঘরে ফিরে এসে মা খাদিজাতুল কুবরাকে (রাঃ) সব খুলে বলেন। তিনি রাসুলকে (সাঃ) (আঃ) শান্তনা দিলেন, অতঃপর রাসুল (সাঃ) (আঃ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের একত্ত্ববাদ, তাঁর রিসালাত এবং পরকালের উপর ঈমান আনার জন্য দাওয়াত শুরু করেন। যা মক্কার কাফিরদের নিকট গৃহিত হলো না। প্রতুত্তরে মক্কার কাফিরগণ প্রচার করতে লাগল যে মুহাম্মাদ (সাঃ) (আঃ) দিওয়ানা ও পাগল (নাউজুবিল্লাহ্)। মক্কার কাফিরদের এ প্রপাগান্ডার মধ্যে সূরা "আল কলম" নাজেল হয়। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে :- তিনি পাগল নন বরং সাথে রাসুল (সাঃ) (আঃ) কে উসওয়াতুন হাসানা (উত্তম আদর্শ) এবং মর্যাদাশালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অহি সূরা মুজামমিল এর কয়েকটি প্রাথমিক আয়াত আকারে এসেছে। ৫ নং আয়াতে:- আমি শীঘ্রই আপনার উপর ভারী কালাম নাজিল করব। দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন রাসুলকে (সাঃ) (আঃ) মানুষেরা ধীরে ধীরে গ্রহন করতে থাকল। আল্লাহ্র বাণী কালামকে মেনে নিতে থাকল তখন কাফেররা বলতে লাগল মোহাম্মদ জাদুকর (নাউজিবিল্লাহ্)।

চতুর্থ অহি আসে সূরা মুদ্দাছির এর ৩০ আয়াত হিসেবে নাজিল হয়:- "তাঁর উপর রয়েছে ১৯ (উনিশ)"। ২০তম এবং ২৫তম আয়াতে মক্কার কাফিরদের সে মিথ্যা প্রচারণা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকে বলা রয়েছে রাসুল (সাঃ) (আঃ) বর্ণনা করেন তা জাদু এবং এই কোরানুল মাজিদ নবী করিম (সাঃ) (আঃ) এর নিজের বাণী এবং ২৬তম আয়াতে মক্কার কাফিরদের কর্মের উপর আল্লাহ্তাআলার নিজের রাগ ও গোস্সার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং বলেছেন যে, "আপনার উপর এরূপ অভিযোগ কারীদের অতি সত্বর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"। ২৮নং এবং ২৯ নং আয়াতে জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর মধ্যে মানুষের রং হবে কালো এবং এরপরে ৩০নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ৭৪ নং সূরা ৩০ নং আয়াত "এরপর ঊনিশ"। জিব্রাঈল (আঃ) যেখানে সূরা মুদ্দাছিরের ৩০তম আয়াত পর্যন্ত থেমে গেলেন এবং এরপর তৎক্ষণাৎ ইকরা (সূরা আলাক) এর বাকী ১৪ আয়াত রাসুল (সাঃ) (আঃ) কে প্রদান করলেন। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তাশীলদের জন্য "এর পর উনিশ" হোয়াট ইজ দ্যা ম্যাটার ? এই বিষয়টা কি ? মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ রেখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নামের উল্লেখের পর এই আয়াত এসেছে। এজন্য এর উদ্দেশ্য ঐ ১৯ ফেরেশতা যারা জাহান্নামের পাহারাদার। কেউ লিখেছেন ইহা ইসলামের ১৯টি মৌলিক ভিত্তি, কিন্তু সবাই একটি বিষয়ে একমত এর মূল বিষয়টি মহান আল্লাহ্পাক ভাল জানেন। সূরা মুদ্দাছির-এর "এরপর ঊনিশ" বলার পর সূরা আলাক ১৯ আয়াতে পূর্ণ হয়ে গেল। সূরা মুদ্দাছির ৩০তম আয়াতে রয়ে গেল।

১৯ এর বিষয় সম্পর্কে গাণিতিক কিছু রূপ রেখা দেওয়া হইল অবশ্য জ্ঞানীদের লেখনি থেকে।

* সূরা আলাক এর ১ম ৫ আয়াতে ১৯টি শব্দ এবং ঐ ঊনিশ শব্দের মধ্যে ৭৬টি অক্ষর যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য। ৭৬ ÷ ১৯ = ৪ । গুণের উদাহরণ:- ১৯ × ৪ = ৭৬।

* কোরানুল মাজিদে ১১৪টি সূরা আছে, এ সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। ভাগের উদাহরণ:- ১১৪ ÷ ১৯ = ৬। গুণের উদাহরণ:- ১৯ × ৬ = ১১৪।

* কোরানুল মাজিদে ১১৪টি সূরা নিচের দিক থেকে গণনা করলে ১৯ নং সূরা আলাক। উপর থেকে গণনা করলে ৯৬ সবই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

* কোরানুল মাজিদের প্রথম শব্দ ১৯ বার. দ্বিতীয় শব্দ ২৬৯৮ বার, তৃতীয় শব্দ ৫৭ বার, চতুর্থ শব্দ ১১৪ বার। সবই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, চিন্তাশীলদের জন্য দৃষ্টান্ত।

* কোরানুল মাজিদে হরফ দ্বারা শুরু হয়েছে ২৯টি সূরা। অর্থাৎ হরুফুল মুকাত্তাআত্ ইহাও গভীর রহস্যপূর্ণ অর্থ বহন করে।

এছাড়াও সাধকদের মত হলো "বিস্মিল্লাহির রহ্মানির রহিম" ইহাতে মোট ১৯টি হরফ সন্নিবেশিত আছে। কলেমাতে দুইটি অংশে মোট ২৪টি হরফ রয়েছে কিন্তু এই ২৪টি হরফে কোন ফোঁটা বা নুক্তা নেই। তাই কলেমার ২৪ হরফ থেকে ৫ বাদ দিলে থাকে ১৯। দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা এই ২৪ থেকে ৫ বাদ দিলে ১৯ ঘন্টার সমাধান। বাকী ৫ ওয়াক্ত নামাজ (পাক পাঞ্জাতন)। বাকী ৫ ঘন্টা এভাবেও অনেকে মত প্রকাশ করে থাকেন। মূল কথাগুলোর আসলে প্রকৃত সমাধান কালে-কালে মানুষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে হয়ত এই রহস্যপূর্ণ "১৯" সহ কোরানুল মাজিদের (যা আল্লাহ্পাক ভাল জানেন) এ কথার সঠিক সদুত্তর মানুষের কাছে পৌঁছাতে সচেষ্ট হবে। কোরান সমগ্র মানব জাতির জন্য মহা গ্রন্থ রূপে জাগরিত থাকবে। "দ্যা কোড অফ লাইফ হলি কোরান"।

কোরানের নাম নিয়ে কিছু কথা

কোরান মহান আল্লাহ্ কর্তৃক সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এই কিতাবের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ওলি-মাশায়েখগণের কিতাবেও এ বিষয়ে মত প্রকাশ রয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় যে বিষয়টা সর্বপ্রথম উপস্থাপন জরুরী তা হলো মওলা আলী (আঃ) বলেছেন:- "আনা আল-কুরআন নাতেকুন ওয়া হাজাল কুরআন সামেতুন" অর্থ এবং উহা (কাগজে লিখিত কোরান) মুক বা নির্জীব কোরান আর আমি (আলী) জীবন্ত কোরান।

তাহলে প্রশ্ন হলো জীবন্ত কোরান কিভাবে হয় ? ধর্মীয় আলোকে তাহা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োগ পদ্ধতি বা আমল নীতিগুলো চলমান সমাজ ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া বিরল। আবার এই প্রসঙ্গ না জানবার কারণে ভ্রান্ত বলে মনে উদয় হয়। তাহলে এ বিষয় সম্পর্কে নিজ গুরুর নিদের্শনা মোতাবেক আমলগুলি চলমান হলে প্রকৃত রহস্য জানা সম্ভব হয়। "বাল হুয়া কোরাআনুল মাজিদ ফি লওহে মাফুজ" (সূরা বরুজ, আয়াত নং: ২১,২২)। কোরান লৌহ মাহ্ফুজে সংরক্ষিত। এখন কথা হলো সংরক্ষণকৃত কোরান আর কাগজে লিখিত কোরান উভয়ের সন্ধান লাভ করা ব্যতীত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু এতটুকুই বলবো আধ্যাত্মিক ভাবে আসল রহস্যের উৎঘাটনের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়। কিতাব সম্পর্কে আরও জটিল মনে হয়। শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ) লিখিছেন:- নূরে মোহাম্মদীর মাধ্যমে বিচিত্র সৃষ্টি রূপে স্রষ্টার বিকাশ বিজ্ঞানকে কেতাব বলা হয়। মূল কথা হলো প্রতিষ্ঠিত মহামানবকে কেতাব বলা হয়।

জাগতিক ভাবে কিতাব অর্থ গ্রন্থ আর কোরান অর্থ পাঠ্য করা হয়, দুই মিলে পাঠ্য-গ্রন্থ। এ বিষয় টুকোই উপস্থাপন করলাম। কারণ আমার মোর্শেদ বলতেন:-"একই ষ্টীলের তৈরী চাকু দিয়ে ডাক্তার বা সার্জন কাঁটে মানুষকে বাঁচাবার জন্য আর কসাই কাঁটে মাংস বিক্রি করবার জন্য। তাহলে উভয়ের নিয়ত জ্ঞান, প্রজ্ঞা কেমন তা আপনার বিবেকের উপর ছেড়ে দিলাম। আলোচনার বিষয় নামসমূহ:- তাই পৃথকীকরণ নাম সম্পর্কে উপস্থাপন ভাবার্থ লিখে শেষ করা যাবে না। এজন্য বিজ্ঞ পাঠক বাবা-মায়ের বিবেকের কাছে ক্ষুদ্র পরিসরে একটু উপস্থাপন রাখলাম। মহান স্রষ্টা সবার প্রতি সহায় হউন।

নাম সমূহঃ- অর্থ সহ

ক্রমিক নংঃ	নাম :-		অর্থ :-
(০১)	আল-কোরআন	=	পাঠ সমূহ
(০২)	আল-ফোরকান	=	পৃথক
(০৩)	আল-কিতাব	=	গ্রন্থ
(০৪)	আজ-জিকির	=	স্মরণ
(০৫)	আত-তানজিল	=	অবতীর্ণ
(০৬)	আল-মাসহাফ	=	গ্রন্থ সমূহ
(০৭)	আন-নূর	=	জ্যোতী
(০৮)	আল-হুদা	=	পথনির্দেশক
(০৯)	আল-কওল	=	কথা
(১০)	কালামুল্লাহ্	=	আল্লাহ্র বাণী
(১১)	মুবারক	=	মহিমান্বিত
(১২)	হিকমাতুন বালিগ	=	পরিপূর্ণ
(১৩)	আল-হাকিম	=	প্রজ্ঞাময়
(১৪)	হাবলুল্লাহ্	=	আল্লাহ্র রুজ্জু
(১৫)	রুহ	=	রুহ (পরনা)
(১৬)	আল-ওয়াহি	=	পত্যাদেশ
(১৭)	আল-ইলম	=	পরমজ্ঞান
(১৮)	আল-হাক্ক	=	মহাসত্য
(১৯)	আল-বাসির	=	সুসংবাদ দাতা
(২০)	আন-নাজির	=	সতর্ককারী
(২১)	আল-মাজিদ	=	মর্যাদাবান
(২২)	আদল	=	সুষম
(২৩)	আমরুল্লাহ্	=	আল্লাহ্র নির্দেশ

(২৪) মুহাইমিন = সংরক্ষক

(২৫) বুরহান = প্রমাণ

(২৬) মুবিন = সুস্পষ্ট

(২৭) শিফা = নিরাময়

(২৮) মাওয়ায়েজ = উপদেশ

(২৯) আলী = সুউচ্চ

(৩০) রিসালাতুল্লাহ্ = আল্লাহ্‌র বার্তা

(৩১) হুজ্জাতুল্লাহ্ = আল্লাহ্‌র প্রমাণ

(৩২) আল-মুসাদ্দিক = সত্যায়নকারী

(৩৩) আল-আজিজ = শক্তিময়

(৩৪) সিরাতুল মুস্তাকিম = সঠিক পথ

(৩৫) ফাইয়ুম = সুদৃঢ়

(৩৬) আল-ফাজল = মিমাংসাকারী

(৩৭) আল-হাদিস = বাণী

(৩৮) আহসানুল হাদিস = সর্বোত্তম উক্তি

(৩৯) নাবউল আজিম = মহা সংবাদ

(৪০) মুতাশাবিহা = সাদৃশ্যময়

(৪১) মাছানি = পুনরাবৃত্ত

(৪২) তানজিল = অবতীর্ণ

(৪৩) আরবি = আরব্য

(৪৪) বাসিয়ার = প্রজ্ঞা

(৪৫) বায়ান = বিবরণ

(৪৬) আয়াতুল্লাহ্ = আল্লাহ্‌র নির্দেশ

(৪৭) আজব = চমৎকার

(৪৮) তাসকিরা = স্বারক

(৪৯) উরওয়াতুল উসকা = (ছয় অবলম্বন)

(৫০) আসসিদক = অতীব সত্য

(৫১) মুনাদি = আহক্ষানকারী

(৫২) আরার বুশরা = আনান্দ বার্তা

(৫৩) বাইয়িনাত = প্রমাণ পঞ্জি

(৫৪) বালাগ = বার্তা

(৫৫) আল-কারিম = মর্যাদাবান

(৫৬) আল-মিজান = ন্যায়দন্ড

(৫৭) নিয়ামাতুল্লাহ্ = আল্লাহ্র অনুগ্রহ

(৫৮) হুদাল্লাহ্ = আল্লাহ্র নির্দেশ

(৫৯) কিতাবুল মুবিন = সুস্পষ্ট কিতাব

(৬০) কিতাবুল হাকিম = বিজ্ঞানময় কিতাব

(৬১) কোরানুল মুবিন = উজ্জ্বল কোরান

(৬২) কিতাবুর মাসতুর = ছত্রলিপি গ্রন্থ

(৬৩) কিতাবুল আজিজ = প্রিয় পুস্তক

(৬৪) জিকরুল হাকিম = কৌশলপূর্ণ

(৬৫) মাতলু অধিক = অধ্যায়ন যোগ্য

(৬৬) লুদাল্লিন নাস = মানবজাতির দিশারী

(৬৭) জিকরুললিল আলামিন = জগত সমূহের জন্য স্বারক

(৬৮) নুরুল্লাহ্ = আল্লাহ্র আলো

(৬৯) জিকরুল্লাহ্ = আল্লাহ্র স্মরণ

(৭০) নুরুল মুবিন = সুস্পষ্ট আলো

(৭১) কালিমাতুল্লাহ্ = আল্লাহ্র বাণী

(৭২) মুহাইমিন = সংরক্ষক

লকব

লকব অর্থ সম্মান সূচক খেতাব, উপনাম, উপাধি, ডাক নাম ইত্যাদি। পরিভাষাগত সংজ্ঞা:- কোন ব্যক্তি নামের সহিত সংযুক্ত বর্ধিত কলে বর থাকলে তা "লকব" হিসাবে বিবেচিত। পূর্বে বা পরে যেমন, মোঃ কামাল বি. এ.। অর্থাৎ এখানে বি. এ. হলো "লকব"। ধর্মীয় দর্শনের উপর মানুষ উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে বিভিন্ন খেতাব বা "লকব" সম্বলিত নাম প্রচলিত। আধ্যাত্মিক দর্শনের আলোকে এরও গুরুত্ব রয়েছে। মানুষ তার গুরুর দেওয়া সাধনা বা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে স্তর অতিক্রম করে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হয়। আবার জাগতিক ভাবে গুরুগণ তাঁর অনুসারীদের যোগ্য ভেবে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেন। এই সবই "লকব" হিসাবে বিবেচিত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলবো, আবু হুরায়রা নামের তাৎপর্য হলো আবু অর্থ বাবা এবং হুরায়রা অর্থ বিড়াল, মূল অর্থ দাঁড়ায় বিড়ালের বাবা। উক্ত সাহাবী বিড়ালকে খুবই ভালবাসতেন। এজন্য রাসুলপাক (সাঃ) (আঃ) এ নামে ডেকেছিলেন। (কথিত সূত্রঃ উল্লেখ করতে পারলাম না)।

জীলানী. জান শরীফ। জীলানী একটি জায়গার নাম, জান অর্থ জীবন, শরীফ অর্থ পবিত্র। মূল অর্থ দাঁড়ায় "জীলানী পবিত্র জীবন" (জাগতিক)। আরও একটু সহজ ভাবে বলতে গেলে পবিত্র কোরানুল মাজিদ মুসলিম অধ্যাসিত পরিবারে প্রায় সবার বাড়িতেই আছে। এই মহা মূল্যবান গ্রন্থটি হেফাজত করতে কাপড় দিয়ে আবরণ বানানো হয়, তার নাম জোজদান। একই কাপড় দিয়ে দরজার পর্দা বানানো হলো। তাহলে উভয় কাপড় একই কিন্তু মূল বিষয় হলো কোরানে আবৃত থাকা কাপড়ের উপরে আমরা চুমু খাই কিন্তু পর্দাতে কেহ চুমু খায় না। আধ্যাত্মিক ভাবে জাগরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত হলে অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো ভাষার মাধুর্যে তাহা উপস্থাপন অনেকটাই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। কারণ ধর্মীয় বিষয় জাগতিক ইরাদা বিপন্ন হলে জগতের বিড়ম্বনার সম্ভবনা থেকে যায়।

গাউসে খোদা মুশকিল কুশা গাউসুল আজম রইসুল আরেফিন পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসে সামদানি শেখ সৈয়দ মওলানা মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী আল-হাসানী ওয়াল-হুসায়েনী (আঃ) নামটা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো, মূল নাম ছিল "আব্দুল কাদের"। তিঁনি তাঁর কর্ম এবং সাধনা দ্বারা এখানে উল্লেখিত পদ বা পদ-মর্যদা ছাড়াও অনেক খেতাব বা লকবে ভূষিত। মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে উল্লেখিত মহামানবের দর্শন, কথোপ-কথন এবং দয়া পরবশ হয়ে কিছু দান করলে উক্ত বিষয় প্রচারের এজাজত বা অনুমতি থাকলে তিঁনি তা "লকব" হিসাবে প্রকাশ করতে পারেন, যদি দয়াল গুরুর নিষেধ না থাকে। আধ্যাত্মিক ধারাবাহিকতা হলো যুক্তির বাহিরে যে যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে, যাহা যুক্তিতে জানা যায় না। সেটা-ও আধ্যাত্মিক ভাবে জানা যায়। দুনিয়ার জমিনে যত তরিকতের নাম রয়েছে, তাহা কোন না কোন শায়েখ থেকেই শুরু এবং সেখানেই স্থানান্তরিত প্রক্রিয়ায় উহা সম্প্রসারিত হয়। অর্থাৎ মূল থেকে স্থানান্তরিত। অনুরূপ ভাবে "জান শরীফ" একটি "লকব"। তাই "জীলানী. জান শরীফ" লকবটি উল্লেখিত বিষয়ের সাদৃশ্য স্বরূপ।

আমার আপন পীর ও মোর্শেদ কেবলায়ে কাবা তাঁর নাম হলো:- "চেরাগে জান শরীফ ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরী (আঃ)" (আরও অনেক লকব আছে)। বাবার পবিত্র জবানে শুনেছি, দাদা জান হুজুর কেবলা চেরাগে জান শরীফ "লকবটি" দিয়েছিল। চেরাগ অর্থ প্রদীপ বা আলো বা নূরময়। এটাকে আরও উচ্চ মার্গের ভাষায় প্রকাশ করলে প্রদীপ্ত হয়। জান শরীফ অর্থ পবিত্র জীবন, প্রদীপ্ত পবিত্র জীবন বা নূরময় আলোকিত পবিত্র সত্ত্বা। যে আলো থেকে বহু আলোর সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর প্রক্রিয়া। চেরাগে জান শরীফ "লকবটি" একটি প্রকাশিত এজাজত প্রক্রিয়ায় স্থানান্তর, তাই মহান মোর্শেদ এই লকব জীবদ্দশায় যাকে দান করবেন তিঁনি এই লকবের উত্তরসুরী।

উচ্চ পরিষদ সম্পর্কে একটু বলতে চাই:- মহান মোর্শেদের সাথে সুরেশ্বর দরবারে গমন করি, দেখলাম জামানার মোজাদ্দেদ শাহ সুফি আহাম্মদ উল্লাহ ওরফে জান শরীফ (আঃ) ওরফে জানু বাবার নাম থেকেই সুরেশ্বরী নামের বিস্তার। কিন্তু সুরেশ্বর একটি ইউনিয়নের নাম।

তাহলে এখানে এই মহান মহামানবের আগমন আলোকিত হওয়ায় উক্ত স্থানের নাম "লকব" হিসাবে পরিচয় ঘটেছে। মহান সুরেশ্বরী বাবার রওজার পাশে একটি ঘর বন্ধ অবস্থায় দেখতে পাই। এ বিষয়ে কৌতুহল জাগল এবং বিষয়টি জানবার পরে জানতে পারলাম, উক্ত ঘরে বেশ কয়েকটি আসন সংরক্ষিত। হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) সহ ছয়টি আসন (বিষয়টি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত)। বর্তমানে উক্ত ঘরটা নামাজের জন্য উন্মুক্ত দেখতে পাই।

হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) বলেছেনঃ- "আমি যার মওলা, আলীও (আঃ) তার মওলা"। এই মওলা লকবটি অন্য কোন সাহাবীর সঙ্গে যুক্ত নয়, শুধুমাত্র মওলা (আঃ) এর সঙ্গেই যুক্ত। মওলা আলীর (আঃ) জীবদ্দশায় উক্ত লকবটি কাউকে দান না করিলে ধীরে ধীরে তা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যম হিসাবে স্থানান্তরিত হতে চলেছে। উপযুক্ততার বিষয়টি বড় আধ্যাত্মিক দর্শনে। পরিশেষে ওলি, পীর, ফকির, গাউস, কুতব, আবদাল, আরিফ সহ সকল ওলিদের পাক পবিত্র কদম মুবারকে ভক্তি রইল।

সিরাজাম মুনিরা

সিরাজাম মুনিরা অর্থ উজ্জ্বল, জ্বলজ্বলে, দীপ্ত, আলোর প্রদীপ, দীপ্তিমান আলো, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নূর। সিরাজ অর্থ চেরাগ, প্রদীপ। মুনিরা অর্থ উজ্জ্বল, আলোকজ্জ্বল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ দীপ্ত নূরময় অবস্থা হলো সিরাজাম মুনিরা।

আল্লাহ্‌পাক সূরা আল-আহজাবের ৪৫ ও ৪৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেনঃ- "হে নবী- আমি (আল্লাহ্‌) আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারী রূপে"। (৪৬) "আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসাবে। কালামপাকে (সূরা নূহ আয়াত নাম্বার ১৬) বলা হয়েছেঃ- এবং চাঁদকে বানাইয়াছেন উহার মধ্য নূর এবং সূর্যকে বানাইয়াছেন প্রদীপ রূপে। অপর একটি সূরায় (নাবা, আয়াত : ১৩) আল্লাহ্‌পাক বলেছেনঃ- এবং আমরা বানাইয়াছি উজ্জ্বল প্রদীপ।

অর্থ বিন্যাস যেমনই হোক না কেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় হাবিবকে (সাঃ) (আঃ) এই খেতাবে ভূষিত করেছেন "সিরাজাম মুনিরা"। এটাই মূল কথা। দুনিয়াতে আলোর প্রধান উৎস হলো সূর্য। এই সূর্যের আলোতে আকাশ মন্ডল এবং ভূ-মন্ডল আলোকিত হয়। প্রাণি জগত থেকে শুরু করে সকল জীব-বৈচিত্র ফুটে উঠেছে। এই আলোর মূল কেন্দ্র হলো সূর্য বা সকল প্রাণের উৎস চেতনা। সূর্যের আলো ছাড়া কোন কিছুরই প্রকাশ পেত না। এই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে সকল জীব-বৈচিত্র হয়েছে। যে কারণে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন চন্দ্র-সূর্যের উদাহরণ হিসাবে আয়াতে কারিমাগুলোতে উল্লেখ করেছেন। তাহলে মূল বিষয় সম্পর্কে শুধু সিরাজাম, "সিরাজাম মুনিরা" বলা রয়েছে। তাই বিষয়টা উপস্থাপনের ইঙ্গিত স্বরূপ কিছু কথা উপস্থাপন করতে গিয়ে কেন জানি বার বার বন্ধন তৈরী হচ্ছে। কারণ হলো এক শ্রেণীর জ্ঞানীগণ এখনও (বর্তমান সময়) পর্যন্ত হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) নূর এটা মানতে পারে নি, তারা রাসুলকে (সাঃ) (আঃ) বলে থাকে তিঁনি আমাদের মত মানুষ (নাউজিবিল্লাহ্‌)। যেখানে তাফসিরে জালালাইন থেকে শুরু করে বহু মাশায়েখগণের তাফসিরে হুজুরপাকের (সাঃ) (আঃ) "নূর"-এ বিষয়টা স্পষ্ট উঠে এসেছে।

এছাড়াও বুখারী শরীফে বিজলীর আলোর ন্যায় এবং মুসলিম শরীফে নূর বা আলোকময় উপস্থাপন করেছে, তবুও তারা মানতে রাজি না। এজন্য আমার মোর্শেদ বর হক বলতেন :- বাবা যে মানবে না তাকে হাজারো দলিল দিলেও মানবে না, কারণ এটা তার তকদির, এজন্য চরম পর্যায়ে কোন গালি থাকে না।

দীপ্তমান প্রদীপ হলো যে আলোতে নিজেই প্রজ্জ্বলন হয়ে অন্যতে আলো বিচ্ছুরণ ঘটায়। যে নিজেই আলো বহন করে। জাগতিক ভাবে বিতরণ যোগ্য ব্যবস্থা বুঝালেও আধ্যাত্মিক হলো আলোতে আলোকিত করে এবং এই আলোর এমনি ধারা যার কোন কমতি বা ঘারতি হয় না। অর্থাৎ অন্যকে আলো দান করলে আলো শূন্য হবার মত নয়। কোটি কোটি সূর্য-চন্দ্র হইতে অধিক আলোময় অবস্থা। বিজ্ঞানীরা সূর্য সম্পর্কে বলেছেন ১০০ বছর পরে সূর্যের আলোক শক্তি বহুলাংশে হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই আলোক ধারা হারাবার নয়। হযরত ওয়ায়েছ করনীকে (রহঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেমন আছেন ? জবাবে বলেছিলেন কেমন আবার থাকবে সে লোক, যে প্রাতে উঠে জানতে পারে না যে মৃত্যু তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবকাশ দিবে কি না! এদিকে দীর্ঘ পথ পড়ে আছে সামনে, পথের সম্বল কিছুই নেই, কাজেই কেমন আছি তার কি বলি। তাঁর সাফল্য সম্পর্কে বলেছেন:- "উচ্চ আসন তালাস করেছিলাম, বিনয় দ্বারা তা লাভ করেছি। সরদারী তালাশ করেছিলাম, সত্যের মধ্যে তা পেয়েছি। গৌরব তালাশ করেছিলাম, দারিদ্রতার মধ্যে তা পেয়েছি। শরীফি তালাশ করেছিলাম, খোদা ভীতির মধ্যে তা পেয়েছি। মহত্ব তালাশ করেছিলাম, তুষ্টিতে তা পেয়েছি। নির্ভরতা তালাশ করেছিলাম, একমাত্র মাবুদের নিরর্ভশীলতায় তা পেয়েছি"।

তাই আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবিব (সাঃ) (আঃ) ১৫ বছর হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যা প্রাপ্তি নবুয়্যত সহ কোরানুল মাজিদের বর্ণনায় বিভিন্ন "লকব" বা খেতাবী উপাধি ঘোষণা করেছে। তেমনি ঘোষিত লকবের একটি হলো "সিরাজাম মুনিরা"। যার পূর্বের ধারণামুলক খেতাব গুলি হলো সাক্ষী, সতর্ককারী, সুসংবাদ-দাতা রূপে প্রেরণ করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) খোদাভীতি, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, পথ ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর যে দিশা বাস্তবায়ন করেছিলেন বা সমুজ্জ্বল সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, তাঁর যে নূরময় প্রজ্জ্বলন সেই "সিরাজাম মুনিরা" থেকেই এই আলোকময় উৎস। আধ্যাত্মিক ভাবে বললে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) হলো সকল আলোর মূল উৎস হিসাবে প্রকাশিত।

এজন্য ওলিদের ভাষায় বর্ণনা হয়েছে যেঃ- "দোনে হিকা শেকেল এক হায়, কুছকো খোদা কাহু" অর্থ দুইজনকে দেখতে একই রকম, কাকে খোদা বলব!

স্রষ্টার সহিত মিলিত রূপের পূর্ণ অবয়বের প্রকাশ হলো মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)। যে কারণে আকাশ, তারকারাজী, চন্দ্র-সূর্য সকল কিছুই তাঁরই আলোতে আলোকিত। তিঁনি ভিন্ন কোন আলোরই অস্তিত্ব নেই, সেটার প্রকাশিত ভাষা হলো "সিরাজাম মুনিরা"। যেমন, হুজুরপাকের (সাঃ) (আঃ) কোন ছায়া জমিনে পরে নি। সূর্য-চন্দ্র, তারকারাজী, বিজলীর চমক কিছুই তাঁর উপর প্রভাব ফেলতে পারে নি বলেই তাঁর ছায়া মোবারক দেখা যায় নি। আবার হাতের আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্রকে কেঁটে দ্বিখন্ডিত করলেন অর্থাৎ তাঁর অনুগত বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল, অনুগত না হলে কতৃত্ব সম্ভব হত না। তাই মহান রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি জ্ঞাপন পূর্বক এমন সান্নিধ্যে বা নিকটবর্তী হওয়াতে আলোচিত খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তরিকতের মাশায়েখগণ বলেন, হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) যখন আলম-ই শাহাদতে পদার্পন করলেন তখন ঐ আলোর উদ্ভাসন সকল আলোকে স্তমিত করে দিলেন।

সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো এই আলোক প্রদীপ বা চেরাগ জ্বালিয়ে দেওয়া হলো এর কোন পতনের সম্ভবনা নাই, এটাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই বিশ্ববাসীর কল্যাণার্থে জাহেরী, বাতেনী, হাকিকি, মারেফতি এবং আরও উর্ধ্ব জগতের যে সকল স্তর রয়েছে, সকল স্তরের উর্ধ্বে অর্থাৎ মূল সাদৃশ্য সম প্রকাশিত ভাবধারায় "সিরাজাম মুনিরা" হিসাবে বা খেতাবে প্রকাশিত হয়েছে। যা দ্বারা সৃষ্টি কূলের সবাইকে উদ্ধার বা দান করিলেও এই ভান্ডারের কোন কমতি হবে না। তাই হলো "সিরাজাম মুনিরা"। তবে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো উজ্জ্বল, দীপ্ত, আলোর প্রদীপ, চেরাগ, নূর, দীপ্তমান আলো যত বিশেষণই উল্লেখ করা হোক না কেন, এসবই রূপক ভাষাগত উপস্থাপন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তি কেন্দ্রিক আমল নীতির মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে স্বরূপ সম্পর্কিত বিষয় আপন দেহ ভূবনে জাগরিত করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাই হলো প্রকৃত বিষয় উদ্‌ঘাটনের প্রকৃত পথ। মহান রাব্বুল আলামিন স্বদয় হলে এবং উপযুক্ত যোগ্যতায় নিজেকে সমর্পিত উপস্থাপন করতে পারলেই কেবল উক্ত বিষয় সম্পর্কে জানা সম্ভব। ইশক আর প্রেমের অবারিত ধারার বর্ষণ নিজের মধ্যে উদ্ভাসন করে মানব-মানবীর কল্যান সাধিত করে, -

মানব-মানবীর কল্যাণ সাধিত করে স্রষ্টার মিলনে একাকার হওয়া। ইহা তো ভাষার শৈলীতে বোঝা দায়। এজন্য প্রকৃত আল্লাহ্‌মুখী প্রেমই পারে সকল পর্দা ভেদ করে মাবুদের মিলন উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাসনকৃত ব্যবস্থায় স্রষ্টার প্রকৃত চাওয়াকে পূর্ণ করতে। হযরত শাইখ ইসমাইল হাক্কী (রহঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ানে সিরাজাম মুনিরা রাসুলকে (সাঃ) (আঃ) তুলনার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

(১) হাবিবের স্মরণাপন্ন হওয়াতে মানুষ তার মূর্খতা ও গোমড়াহীর অন্ধকার হতে পরিত্রান লাভ করত জ্ঞান ও সৎ পথের সন্ধান লাভ করবে। যেমন চেরাগের আলোতে মানুষ রাত্রির অন্ধকারে পথ চলে আপন গন্তব্যে পৌঁছে যায়। (২) রাত্রির অন্ধকারে কোন বস্তু হারিয়ে গেলে চেরাগের আলো দ্বারা তা খুঁজে বের করা যায়। তদ্রুপ সৃষ্টির যে সকল হাকিকত মানুষের অজানা ও তাদের জ্ঞান হতে গোপন ছিল, নূরে মোহাম্মদীর (সাঃ) (আঃ) প্রভাবে অন্তরের চোখ দ্বারা মানুষ ঐ গুলি উপলব্ধি করতে পারবে। (৩) পার্থিব চেরাগ দ্বারা গৃহবাসী নিরাপত্তা ও আরাম লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে চোর, ডাকাত, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি হতে নিজেদের হিফাজত করে থাকে। পক্ষান্তরে হাবিবের (সাঃ) (আঃ) নূরী প্রভাবে মানব জাতি আখিরাতের ভীষণ বিপদ হতে মুক্তি লাভ করতে পারবে। জগতে অন্তর চক্ষু দ্বারা ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হবে। (৪) একটি চেরাগ হতে জগতের লোকেরা হাজার হাজার চেরাগ প্রজ্জ্বলন করলেও ঐ মূল চেরাগটির আলো কিঞ্চিত পরিমান হ্রাস পেতে দেখা যায় না। তদ্রুপ আল্লাহ্‌তাআলার হাবিবের (সাঃ) (আঃ) নূর দ্বারা নিখিল বিশ্বের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন অথচ হাবিরের (সাঃ) (আঃ) নূর একটুও হ্রাস পায় নি। তাই প্রকৃত ভান্ডার যাকে প্রজ্জ্বলন করে তাঁর কি আর কোন কিছুতে কমতি থাকে!

এমন ধারাবাহিকতার আল্লাহ্‌র ওলির বা ওলিদের শান কিছু কিছু উল্লেখ দেখতে পাই। যেমন বাবা বায়োজিদ বোস্তামী বলেছেন:- "লাইসালা-ফি-জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্‌তাআলা" অর্থ আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কিছুই নাই। বাবা মুনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন:- "আনাল হক" অর্থ আমিই সত্য বা আল্লাহ্‌। বাবা বায়েজিদ বোস্তামীর পীর হলেন ইমামে আজম বাবা জাফর সাদিক। ইমাম আবু হানিফার পীর হলেন বাবা জাফর সাদিক। সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায় অনেকে পীর মানেন না। সত্যিই বিরল মানুষের ভাবলেশ একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ এসে গেল যাহা -

পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ রইল। হযরত শাহ সুফি মওলানা আঃ আজিজ দেহলভী (রহঃ) "ছায়েফুল মোকাল্লেদীন" কিতাবে উল্লেখ। "শরহে ফিকহে আকবার" কিতাবে বর্ণিত হয়েছে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন যে:- আমি ৯৯ বার আল্লাহ্‌কে দেখেছি। উক্ত বিষয় সমূহ উল্লেখ রাখলাম যারা মানেনই না যে আল্লাহ্‌কে দেখা যায়। তাঁর সৃষ্টি জগত ও রহস্যপূর্ণ ভান্ড সম্পর্কে বলা পাগলে প্রলাপ বৈকি আর কিছু নয়।

প্রথম বইটি প্রকাশ হবার পর আমার স্বীয় মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন, বাবা কিছু লিখতে গেলে পর্যাপ্ত দলিল সহ উপস্থাপন করিও। সবার কাছে উপস্থাপনকৃত বিষয়টা তোমার মত করে বললে মানুষ শিখতে চাইবে না। বার বার মনে পড়ে এমন বিষয় উপস্থাপিত করি যা উপমা ব্যতীত কিছুই তুলে ধরা সম্ভব হয় না। পরিশেষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানীদের কাছে আকুল আবেদন, দর্শন ভিত্তিক ধর্মীয় উপস্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের সকল ধোঁয়া-কুয়াশাকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রকৃত একত্ত্ববাদের ধারাতে মানব জাতিকে হিংসা, ঘৃণা দলাদলির ধ্বংসযজ্ঞ বিধি-বিধান হতে উৎরাইতে সহায়ক ভূমিকা পালনে ব্রতী হউন। তদ্রুপ ধর্মীয় মূল আলোচনা হলো "সিরাজাম মুনিরা" উল্লেখিত লকব বা ধর্মীয় দর্শনের আলোকে, মানুষকে ধর্মীয় ধারার শিক্ষা ও মুক্তি যে শিক্ষা রাসুলে পাক (সাঃ) (আঃ) দেখালেন তাঁর ধারাবাহিকতা অনুসারে মানুষকে মোরাকাবা-মোশাহেদাতে আগ্রহীশীল হিসাবে গড়ে তুলতে ধর্মীয় প্রতিনিধিগণের অনুরোধ রাখলাম। স্বীয় আধ্যাত্মবাদের অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে জাগ্রত করে মানবের মুক্তির মূল ধারা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে মহান স্রষ্টার অনুমতিক্রমে প্রকৃত ধর্মের প্রতিনিধিত্ব স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান হলেই কেবল ধর্ম নিয়ে এই বিড়ম্বনার অবসান হবে বলে মনে করি।

তাই হুজুর পাকের (সাঃ) (আঃ) আধ্যাত্মিক প্রকাশিত একটি "লকব" হলো এই "সিরাজাম মুনিরা"। ইহা দ্বারা মানবিক বিকশিত গুণ ও আদর্শ দেখে মানুষ প্রকৃত মানুষ রূপে নিজেকে তৈরী করতে তাঁর সান্নিধ্যে অবদান নিয়েছিল। উক্ত কার্যকরী ক্ষমতার দ্বারা মানুষকে উদ্ধার করে গোটা দুনিয়ার বুকে সকল ধর্ম-বর্ণের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন বা আজও বিশ্বের সকল জ্ঞানীর নিকট চির অম্-ান। মহান রাব্বুল আলামিন প্রকৃত বিষয় বুঝবার তৌফিক দান করুন। সবার মঙ্গল কামনায় এ বিষয়ে এতটুকুই সংক্ষেপে রাখলাম।

মেরাজ

(৫১ বছর : ২৭ রজব)

মেরাজ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ উর্ধ্বগমন বা উপরে উঠা, ভ্রমন করা, আরোহণ করা। আরাজা হতে মেরাজ (আরবি) শব্দ এসেছে।

ইতিহাস অনুযায়ী নবুয়্যত প্রকাশের একাদশ বৎসরে (৬২০ খ্রিষ্টাব্দ) ২৬শে রজব তারিখের দিবাগত রাত্রে নবী মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) প্রথম কাবা শরীফ থেকে জেরুজালেমে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসা গমন করেন। সেখানে তিঁনি জামাতে ইমামতি করেন এবং উক্ত স্থান হতে বোরাক নামক বিশেষ বাহনযোগে আসীন হয়ে উর্ধ্বলোকে গমন করেন। উর্ধ্বাকাশে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেস্তা তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন।

পবিত্র কোরানুল মাজিদের সূরা বনী ইসরাইলের ১ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে :- "পবিত্র মহান সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি, তিঁনিই সর্বশ্রোতা সর্ব দ্রষ্টা"। সাইয়্যেদুল আম্বিয়া নবী-রাসুলদের সর্দার, আল্লাহ্পাক তাঁর কালামপাকে এরশাদ করেনঃ- "হে রাসুল আমি আপনাকে মানব জাতির জন্য রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছি" (সূরা সাবা, আয়াত : ২২)। মহানবীর (সাঃ) (আঃ) নবুয়্যতকে শক্তিশালী করবার জন্য অন্যান্য প্রতিনিধি বা নবী-রাসুলগণের মত তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল অগণিত মোজেজা, তার মধ্যে মেরাজ অন্যতম।

শবে মেরাজ

শব ফারসি শব্দ যা অর্থ রাত বা রজনী। মেরাজ আরবি শব্দ এর অর্থ সাক্ষাত। কিন্তু বেশির ভাগ তাফসীর বা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে উর্ধ্ব গমন। যেহেতু সাক্ষাত এবং উর্ধ্বগমন দুইয়ের কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, আধ্যাত্মিক জগত নিয়ে যারা বিচরণ করেন তাদের সবাই সাক্ষাত হিসাবে প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে রাসুলেপাক (সাঃ) (আঃ) মেরাজ হতে ফেরার পর যখন মেরাজের বর্ণনা দিলেন, তখন সাহাবাগণ বলিল ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) তাহলে আমাদের কি সাক্ষাত হবে না! তখন হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) বলেছিলেন:- মমিনের জন্য দিনে ৫ (পাঁচ) বার সাক্ষাত" (আস্সালাতু মেরাজুল মুমিনিন)।

নিম্নে কোরানুল মাজিদ থেকে আরও কিছু আয়াতে কারিমার উল্লেখ রইল পাঠকদের অনুধাবনের জন্য।

সূরা নজম, আয়াত : ১ থেকে ১৮।

১. এবং তারকা সমূহ (ওয়ান নাজমে) যখন নিজ প্রবৃত্তির অধীন হয় (ইজা হাওয়া)।

২. তোমাদের সাথী (সাহেবুকুম) বিপথগামী নহেন (মাদাল্লা) এবং বিভ্রান্তও নহে (ওমা গাওয়া)।

৩. এবং তিঁনি কথা বলেন না (ওয়ামা ইয়ানতেকু) নিজ প্রবৃত্তি হইতে (অনিল হাওয়া)।

৪. যদি উহা (ইনহুয়া) হুকুম করে (ওয়াহয়ুই) অহি ছাড়া নয় (ইল্লা ইউহা)।

৫. তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় (আল্লামাহু) অনেক শক্তিশালী (কুয়া) শক্তির মাধ্যমে (শদ্দিদ)।

৬. তিঁনি নিজেকে দেখিয়াছেন (হুমেররাতিন) সুতরাং তিঁনি স্থীর হইয়াছেন (ফায়তাওয়া)।

৭. এবং তিঁনি ছিলেন সর্বোচ্চ (ওয়া হুয়া আলা) আকাশ দিগন্তে (বিল উফুকে)।

৮. তার পর (তিঁনি) নিকটে আসিলেন (সুম্মাদানা) সুতরাং অতি নিকটে (ফাতাদাল্লা)।

৯. সুতরাং (তিঁনি) ছিলেন (ফাকানা) দুই ধনুকের ব্যবধানে (কাবা কাউসাইনে) অথবা আরও নিকটে (আও আদনা)।

১০) সুতরাং অহি করিলেন (ফা আওহা) তাঁহার বান্দার দিকে (ইলা আবদেহী) যাহা অহি করিবার (মা আওহা)।

১১) তাঁহার অন্তঃকরণ (ফুয়াদ) অস্বীকার করে নাই (মা কাজাবা) যাহা তিঁনি দেখিয়াছেন (মা রাআ)।

১২) তোমরা কি তাঁহাকে অপবাদ দিবে (সাফাতু মারুনাহু) যাহা উপরে তিঁনি দেখিয়াছেন (আলা মা ইয়ারা)।

১৩) এবং অবশ্যই তিঁনি দেখিয়াছেন (ওয়ালাকদ রাআহু) নাজেল (অবতীর্ণ) অবস্থায় (নাজলাতান) দ্বিতীয় বার (উখরা)।

১৪) নিষিদ্ধ (মুনতাহা) কূল বৃক্ষের (বরই) নিকটে (এনদা সেদরাতে)।

১৫) উহা ছিল জান্নাতুল মাওয়ার নিকটে।

১৬) যখন কূল বৃক্ষটি অন্ধকারেই অবস্থিত ছিল (এজ ইয়াগশাস সিদরাতা) যে ভাবে অন্ধকারে আচ্ছদিত হবার (মা ইয়াগশা)।

১৭) (তাঁহার) দৃষ্টিশক্তি ঢাকিয়া ছিল না (মাজাগাল বাসারু) এবং তিঁনি সীমা অতিক্রমও করেন নাই (ওয়া মা তাগা)।

১৮) অবশ্যই (তিঁনি) দেখিয়াছেন (লাকাদ রাআ) তাঁহার রবের (নিকট) হইতে বড় আয়াত (নিদর্শন) (মিন আয়াতে রাব্বেহির কুবরা)।

৫ম (পঞ্চম) আয়াতে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় অনেক শক্তিশালী শক্তির মাধ্যমে। তাহলে সেই শক্তি কি! চিন্তাশীলদের জন্য ভাববার বিষয়। অনেকে এই আয়াতে ফেরেস্তা উল্লেখ করেন এবং সরাসরি জিব্রাঈল (আঃ) এর নাম সর্বস্ব উল্লেখ করেন।

৯ম (নবম) আয়াতে দুই ধনুকের ব্যবধান এর চাইতেও নিকটে। একটি ধনুক সমান অর্ধ বৃত্ত, আর দুই ধনুক সমান বৃত্ত। আওয়াদনা অন্যত্র বলা আছে বৃত্ত না হইলে বৃত্ত বানিয়ে নাও। আলোচ্য আয়াতে বৃত্ত যাই হোক তা লাগানো বা কম্প্যাক্ট বোঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করি। জাগতিক ভাবে উল্লেখ করলে খুবই নিকটে মেরাজের সাক্ষাতের ব্যাপারে বহু বছর থেকেই -

প্রচলিত আছে, আল্লাহ্ সত্তর হাজার পর্দার আড়াল থেকে রাসুল (সাঃ) (আঃ) দেখা করেছেন কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর কালামপাকে উল্লেখ, কোন পর্দা বা আবরণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ আমাদের সাথেও সাক্ষাত দিবেন, তাঁর (আল্লাহ্) সাক্ষাত থেকে বিমুখ থাকলে কাফের বা পথভ্রষ্ট হয়। কাজেই সাক্ষাত বিষয়ে শিক্ষা লাভ জরুরী।

অনেক ফকিহগণ মেরাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম অংশ ইসরা যেমন সশরীরে, সজ্ঞানে, জাগ্রত অবস্থায় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও হযরত মিকাঈল (আঃ) বিশেষ বাহন বোরাকের মাধ্যমে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা হয়ে আসমান থেকে একে একে সপ্তম স্তর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছায়। সেখান থেকে একাকী রফ্‌রফ্ বাহন যোগে আরশে আজিমে পৌঁছায় এবং মহান রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ হয়। জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করে ফিরে আসেন। বিশেষত রাত্রিকালীন বায়তুল্লাহ্ হতে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে ইসরা বলে এবং দ্বিতীয় অংশকে মেরাজ বলে।

মেরাজ সফরে যাদের সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ)।

দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)।

তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ)।

চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস (আঃ)।

পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আঃ)।

ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা (আঃ)।

সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)।

সালাম কালাম ও কুশলাদী বিনিময় শেষে তিঁনি বায়তুল মামুরে গেলেন, সেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেস্তা আসেন এবং প্রস্থান করেন, দ্বিতীয় বার আসার সুযোগ হয় না। অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহার কাছে গেলেন এবং সেখানে চারটি নদী দেখলেন, দুইটি প্রকাশ্য এবং দুইটি অপ্রকাশ্য।

অপ্রকাশ্য নদী দুইটি জান্নাতের এবং প্রকাশ্য নদী দুইটি নীল ও ফোরাত। তারপর বায়তুল মামুরে পৌঁছালে এক পেয়ালা শারাব, এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মধু পেশ করা হলে তিঁনি (রাসুল সাঃ) দুধ পান করলেন। এটাই স্বভাব সুলভ ইসলাম। (বুখারী শরীফ ৩৬৭৪ খন্ড, ১ম পৃষ্ঠা, ৫৪৮ থেকে ৫৫০)।

এছাড়াও রয়েছে বায়তুল মোকাদ্দাসে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করার পর সিঁড়ী আনা হয়। যাহাতে নিজ থেকে উপর যাবার জন্য ধাপ তৈরী করা ছিল। তিঁনি সিঁড়ীর সাহায্যে প্রথম আকাশে অতঃপর অবশিষ্ট আকাশগুলিতে গমন করেন। প্রতিটি আকাশে ফেরেস্তারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। প্রত্যেক আকাশে পয়গাম্বরগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। আসমান ৭ম স্তর বা আকাশ শেষে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শুনতে পান। সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি বিভিন্ন রঙের অসম্ভব ছোটাছুটি করছে, ফেরেস্তারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছে। রাসুলকে (সাঃ) (আঃ) সেখানে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তার স্বরূপ দেখান "তার ছয়শত পাখা এবং সেখানে তিঁনি একটি দিগন্ত বেষ্টিত সবুজ রফ্‌রফ্‌ দেখতে পান, এটাকে পালকির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এত কিছুর বর্ণনা কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো গমনের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন রাসুল (সাঃ) (আঃ) এর জন্ম তারিখ নিয়ে বিভিন্ন ফেকরার অনুসারীগণ বিভিন্ন দিবসে পালন করে থাকে। তদ্রুপ হযরত মুসা ইবেন ওকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হিজরতের ছয় মাস আগে সংঘটিত হয়। ইমাম নববী ও কুরতুরির মতে, নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন, মেরাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল যখন আরবের সকল গোত্রে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল"। ইমাম হরবি বলেন, রবিউস সানি মাসের ২৭ তারিখ রাতে হিযরতের এক বছর আগে ঘটেছিল। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন, নবুয়ত প্রাপ্তির ১৮ মাস পর সংঘটিত হয়েছে। বেশির ভাগ মতে নবুয়্যতের ১০ম বর্ষের রজব মাসের ২৭ তারিখে মেরাজ সংঘটিত হয় ইত্যাদি ভাবে উল্লেখ। প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা ভাবুন আপনার বিবেকের চিন্তা-চেতনায় যেমনটা কার্যকরিতা পাবে।

জাগতিক আলোচনা আরও কিছু বিষয় তুলে ধরা জরুরী :-

মেরাজ রজনীতে আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় হাবিব একান্ত সাক্ষাতে ১৪ বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে।

১) আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত না করা।

২) পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্য ব্যবহার করা।

৩) নিকট স্বজনদের অধিকার নিশ্চিত করা।

৪) মিসকিন ও পথ সন্তানদের অধিকার দেওয়া।

৫) অপচয় না করা।

৬) কৃপণতা না করা।

৭) সন্তান হত্যা না করা।

৮) ব্যভিচার না করা।

৯) মানব হত্যা না করা।

১০) এতিমের হক (সম্পদ) নষ্ট না করা।

১১) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।

১২) মাপে কম না দেওয়া।

১৩) পৃথিবীতে গর্ব ভরে না চলা।

১৪) যে বিষয়ে জ্ঞান নাই তা থেকে অবস্থান সরানো।

এই সকল মন্দ রবের নিকট অপছন্দনীয়। এছাড়াও জাহান্নামে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির বিবরণ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ রয়িাছে এবং মাশায়েখদের কিতাবে সুস্পষ্ট। আধ্যাত্মিক বর্ণনার মূল ধারাবাহিকতা হলো "মেরাজ"। ভাবগত অর্থ যেটাই হোক না কেন এর মূল কিন্তু সাক্ষর রেখেছেন:- হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) আম্মাজান উম্মে হানীর ঘরে শায়িত ছিলেন, বিছানা গরম, অযুর পানি গড়াইতেছিল। আরও উল্লেখ হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) কে আম্মাজান উম্মে হানী এই মেরাজের বর্ণনা দিতে অসম্মতি করেছেন ইত্যাদি। এ সবকিছুর আলোকে "মেরাজ" ঘটনা উল্লেখ রয়েছে।

হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) মেরাজের বর্ণনা দিলেন এবং সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করলেন হযরত আবু বকর। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) উক্ত সাহাবাকে "সিদ্দিক" উপাধিতে (লকবে) ভূষিত করলেন। তারপর থেকে নাম "হযরত আবু বকর সিদ্দিক"। উনি হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন :- ইয়া রাসুলাল্লাহ্- আল্লাহ্ দেখতে কেমন! নবী করিম (সাঃ) (আঃ) জবাব দিলেন তোমার মত। অতঃপর উসমান (রাঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্, আল্লাহ্ দেখতে কেমন! নবীজী জবাব দিলেন তোমার মত। অতঃপর ওমর (রাঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন এবং একই কথা নবীজী জবাব দিলেন "তোমার মত"। তাহলে তিনজন সাহাবার প্রশ্নের উত্তর একই।

প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা, এ বিষয়ে বুঝতে চাইলে আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন ব্যতীত বোঝা দায়। এজন্য অনেকে এ সকল আলোচনা থেকে দূরে রাখে। এরও পূর্বে জিব্রাঈল (আঃ) এর জানতে চাওয়া একই প্রশ্ন সে বিষয়টা হয়ত উল্লেখ নাই করি। দৃঢ় ও দীপ্ততার সহিত এতদ বিষয়টি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, সেখানকার ধারাবাহিক প্রণালী অনুযায়ী কালামপাকে আল্লাহ্পাক বর্ণনা করেছেন:- "আস্সালাতু মিরাজুল মুমিনিন" অর্থাৎ নামাজ (সালাত) মমিনের মেরাজ। ইহা সকল মানব-মানবীর জন্য। জ্ঞান হবার পর থেকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলাম ধর্মের ক্রিয়াশীল আমলের ধারাতে, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে মেরাজ ভাগ্যে হলো না। আবার ধর্মের এত শিক্ষাকেন্দ্র এবং শিক্ষকগণ মানুষকে মমিনে উপনীত করে কালামপাকের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর (মমিনের) নিরীক্ষা অন্তে শিক্ষার সমাপন ঘটবে এমন স্থান বা কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া বিরল। কারণ জ্ঞান গবেষণা দর্শন ভিত্তিক না হলে যা হয়। আল্লাহ্পাক তাঁর কালামপাকে আমাদের দর্শন ভিত্তিক ব্যবস্থার কথা বার বার উল্লেখ করলেও আমরা সে দিকে মনোনিবেশ করতে চাই না। জ্ঞান বিকাশের ধারা অনুযায়ী বিদ্যার কচকচানিতে নিজেকে বড় দেখানোর প্রচেষ্টায় আহামরি ভাব খানাতে (আমার মত) বেশি ব্যস্ত। ধর্মের জঞ্জাল অপসারণে এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরী বলে মনে করি।

সাধকদের ভাষ্য হলো মেরাজ ভাবের ভূবন। এ প্রসঙ্গে গাউসে খোদা মুশকিল কুশা গাউসুল আজম রইসুল আরেফিন পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসে সামদানি শেখ সৈয়দ মওলানা মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী আল-হাসানী ওয়াল-হুসায়েনী (আঃ) একই সঙ্গে কয়েকজন অনুসারীর বাড়িতে ইফতার করলেন সশরীরে হাজির হয়ে। তাহলে ভাবের ভূবনে বিচরণ আত্মিক ও দেহ সহ উভয় প্রক্রিয়াতে এটা সম্ভব হতে পারে। কারণ নিজ আমল নীতির কার্য প্রণালী উপর তা নির্ভরশীল। আত্মিক সাধনার বহু দৃষ্টান্ত দুনিয়ার বুকে স্বাক্ষর রেখেছে। যোগ-সাধনার বলে মানুষ দেহ সহ উপরে আরোহণ করবার ভিডিও চিত্রগুলি বর্তমান টেলিভিশন চ্যানেল বা ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের দোঁড় গোড়ায় পৌঁছেছে। তাই এ বিষয়ে অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

বাউল সাধক লালন ফকির তাঁর গানের ভাষায় বলেছেন :-

“ মেরাজ সে ভাবেরই ভূবন

গুপ্ত আলাপ হয়রে দু’জন

কে পুরুষ আকার কি প্রকৃতি তাঁর

শাস্ত্রে প্রমাণ কি রেখেছে ! ”।

একজন নিরক্ষর ব্যক্তি তাঁর ভিতর থেকে কিভাবে ধর্মের এ সকল বিষয় উপস্থাপন করেন, বিষয়গুলো ভাববার জন্য উপস্থাপন রাখলাম। সাধনার দ্বারা মানুষ লব্ধ জ্ঞান হাসিলের মাধ্যমে জানতে পারে, দেখতে পারে, বলতে পারে, নিজেকে পরিভ্রমন করতে সক্ষম হয়। এগুলো তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রসঙ্গে হাজা হাবিবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্লাহ শাহান শাহে ওলি আফতাবে ওলি সুলতানুল হিন্দ হিন্দাল ওলি আতায়ে রাসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ শেখ সৈয়দ মাওলানা মঈনউদ্দিন হাসান সানজারী আল-হুসায়েনী ওয়াল-হাসানী (আঃ) বলেছেন :- “একজন গন্ড মূর্খও যদি ফানা ফিল্লাহ্‌র স্তর অতিক্রম করে তাহলে সে দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানীর চাইতে বেশী জানে (জ্ঞানী)”।

এখন ফানা ফিল্লাহ সম্পর্কে যার জানা নাই এমন জ্ঞানী যিনি আপন স্বকীয়তায় স্বীকার করে নেবে এমন ব্যক্তি পাওয়া খুবই দুরূহ, উল্টা ভিন্ন ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। ভিত্তিহীন নির্ভরযোগ্য কোন দালিলিক প্রমাণ ব্যতিরেকে কিছু কথা আমরা লোক সমাজে প্রচলিত ভাবে শুনে থাকি, মেরাজ সম্পর্কিত এমন সময়ে ফেসবুকে দেখি মেরাজের সময় ১১ সেকেন্ড উল্লেখ।

এছাড়াও নবী (সাঃ) (আঃ) জিন্দিগির ২৭ বছর সময়ে মেরাজ সংঘটিত হয়ছে বা অতিবাহিত হয়েছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্মের আলোচনাতে শুনে শিক্ষার ধারাবাহিকতায় প্রচারতব্য রয়েছে। এছাড়াও মেরাজ ঘটনার অস্বীকার করায় জৈনক ব্যক্তি তার স্ত্রী মাছ কাঁটতে বসেছে, সে নদীতে গোসল করতে গেছে, নদীতে ডুব দেবার পর এক সুন্দর রমণী হয়ে উঠল। অতঃপর এক বণিক যাইতে তাকে নিয়ে গেল এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। সেখানে তিনটি সন্তান হলো, অতঃপর একই ভাবে একদিন পুনরায় গোসল করতে এসে ডুব দেবার পর পূর্বের অবস্থা ফেরত হয়ে সে দেখতে পেল, সে যে স্থানটিতে গোসল করতে এসেছিল সেখানেই সে গোসলের বসন ঠিক রয়েছে। বাড়ীতে এসে দেখল বিবির মাছ কাঁটা চলমান। অথচ তার জীবনে ঘটনা প্রবাহ এমন (সংক্ষিপ্ত)। এমন অনেক ঘটনা মেরাজ সম্পর্কে চলমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত।

নবী (সাঃ) (আঃ) জিন্দিগির "মেরাজ" বিষয় সম্পর্কে আধ্যাত্মিক ভাবে উল্লেখ করতে গেলে, এটা একটি মোজেজা। দালিলিক নির্ভরতার বাইরে বিষয় সম্পর্কে অনুধাবনে এর পরিপূর্ণতা জ্ঞাত হবার বিষয়ে সচেষ্ট হবে বলে মনে করি। এ বিষয়ে একটু ধারণা রাখতে চেষ্টা করলাম। সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্‌র নূর থেকে সৃজিত হলো বা বিকাশ ঘটলো তা হলো নূরে মোহাম্মদী। এই নূরে মোহাম্মদী নূর থেকে সকল কিছু সৃষ্টির বিকাশময় ধারা চলমান। এই নূরসহ মানব জগত থেকে মূল সত্ত্বার সাক্ষাত বা লীন হবার প্রক্রিয়া হলো "মেরাজ"। তাহলে যা থেকে সকল কিছুর বিকাশ বা চলমান, তা কেন্দ্রে সমাসীন হলে সকল কিছু দাঁড়ায় বা থেমে যায়। এই অস্তিত্বে চলমান ব্যবস্থা স্থীর প্রক্রিয়া দলিল দ্বারা কি ভাবে বোঝানো সম্ভব! তা আমার জানা নাই।

প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা, কোন কিছুর সুইচ অফ বা বন্ধ করলে তার কার্যকারিতাও বন্ধ হয়ে যায়। সময় চলমান থাকার কারণে আমরা তা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হই। তদ্রুপ সকল কিছু বলতে সৃষ্টিতে যা কিছু রয়েছে সকল কিছুর কেন্দ্র "নূরমোহাম্মদ" দ্বারা চলমান এবং এটা মূল প্রথম ধাপের বিভাজন প্রক্রিয়ার অংশ, সে কারণে প্রকাশিত ভাবধারাতে এটাই প্রথম ধাপ হয়। মূল ধাপ তো মহান স্রষ্টা। এই ধাপের বর্ণনা না থাকাটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে "সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে" আমার লেখা "সেই সত্ত্বা" বইটি পড়তে অনুরোধ রাখলাম।

এ বিষয়ে কোন কোন আলেমগণ বলে থাকেন, মালাকাল মউত আজরাঈল (আঃ) যখন জিব্রাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে গিয়ে হুজুরপাকের (সাঃ) (আঃ) নিকট আসলেন, হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) বলিলেন আমার সময় পূর্ণ হয়েছে তখন ফেরেস্তা জিব্রাঈল (আঃ) জানালেন মেরাজে অতিবাহিত হবার ২৭ বছর, এমন বর্ণানা শ্রবণ করে থাকি। মূল কথা হলো সিদরাতুল মুনতাহা থেকে ফেরেস্তা রাজ্য অচল। মূল বা মূলের প্রথম ধাপের সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া হলো চূড়ান্ত প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু। তাই ইহা বিভিন্ন জ্ঞানীগণের সংযোজিত মত বৈকী। মূল বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত অনুধাবন প্রক্রিয়া হলো নিজেকে স্রষ্টার দর্শন সাপেক্ষে পূর্ণ জ্ঞাত হবার আহ্বান। বিষয়টা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থাতে সমাসীন বটে। এজন্য কালাম পাকে বর্ণনা এসেছে :- "আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন" অর্থ নামাজ মুমিনের জন্য মেরাজ স্বরূপ। তাই দর্শনবাদ সম্পর্কে যারা মানতে চায় না তাদের দ্বারাই এত বিভিন্নতা লোক-সমাজে চলমান। কোন এক সাধক তাঁর রচনাবলীতে উল্লেখ করেছেন:- "যে নামাজে মেরাজ হয় না, সেজদা তুমি দিলে কারে, নামাজে নামাজিকে সরল পথে আনতে পারে!"। সকল চৈতন্য ধারার মূলনীতি হলো "দর্শন"। তাই আধ্যাত্মিক ভাবে ধর্মের কার্যাবলী দর্শনে পূর্ণতা রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে ইহা বোঝা দায়।

কোন এক (জাল) হাদীসে উল্লেখ, হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) ৫০ ওয়াক্ত নামাজ বরাদ্দ নিয়ে রওনা হলেন। (অন্যান্য নবীগণের সুপারিশে তা কমাতে কমাতে ৫ ওয়াক্ততে এসে স্থীর হলো। এমন বয়ান হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-কে অন্যান্য নবীদের চাইতে খাট করা, এহেন রচনা শৈলী দ্বারা হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) -

বুঝতে পারে নি যে তাঁর উম্মতের কষ্ট হবে, তারা পালন করতে পারবে না)। যারা এমন বয়ান প্রচার করে তাদের বিবেক দ্বারা ভাববার অনুরোধ রইল। কারণ দিনরাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একজন মানুষের (বিশ্রাম, গোসল, খাওয়া-দাওয়া অন্যান্য বিষয়ে মোট ব্যয় হয় ৮ ঘন্টা আনুমানিক) বাকী ১৬ ঘন্টা ৫০ ওয়াক্ত দ্বারা ভাগ করলে দাঁড়ায় ১৯ মিনিট ২০ সেকেন্ড পরপর এক-একটি ওয়াক্ত তাহলে কাজকর্ম তো কিভাবে জীবন চলে জ্ঞানীদের জন্য এই উদাহরণ টুকু উপস্থাপন করিলাম। তাহলে সরকারে দোআলম, সরদারে হাসমী এহেন বিষয় ভেবে ছিল না বা আল্লাহ্পাক এমন বিধান হুজর (সাঃ) (আঃ) উম্মতদের জন্য মনোনীত করলেন।

তাই আজকের দুনিয়াতে ধর্মের অবাঞ্চিত তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষার জন্য মওলা আলীর (আঃ) বাণী হলো :- "তোমরা যখন কোন হাদিস শোন তা জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষা করিও, কেননা হাদিস বর্ণনাকারী লোকদের সংখ্যা অনেক কিন্তু হাদিসের সঠিকতা রক্ষা করা লোকের সংখ্যা খুবই নগন্য"।

স্রষ্টার প্রতিনিধিগণের কিছু মোজেজা ও কারামত

মুজেজা :- মুজেজা শব্দের অর্থ হল অলৌকিক ঘটনা বা অসম্ভব নিদর্শন অক্ষমকারী। মোজেজা শব্দের আভিধানিক অর্থ "কোন কাজ সম্পাদনে অথবা কোন বিষয় প্রদর্শনে অক্ষম করা, অভিভূত করা"। স্রষ্টার প্রেরিত নবী-রাসুলগণ দ্বারা (আল্লাহ্ কর্তৃক) যে সকল কর্ম যা প্রকৃতি বিরুধী অলৌকিক, অস্বাভাবিক, অসাধারণ, নিদর্শনীয় কাজ প্রকাশ পায় তাই মোজেজা। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে যাওয়া, হযরত শীস (আঃ) মায়ের গর্ভ ব্যতীত জন্মলাভ, হযরত ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত জন্ম লাভ ইত্যাদি অলৌকিক কার্যের মাধ্যমে হুজুরপাকসহ (সাঃ) (আঃ) অন্যান্য নবী-রাসুলগণ বা মহাপুরুষদের আগমনের আগে এবং পরে বহু অলৌকিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা মোজেজা হিসাবে সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

কারামত :- "কারামত" শব্দটি আরবি একবচন। বহুবচনে "কারামাত" এর অর্থ বিশেষ ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান ইত্যাদি, ধর্মীয় পরিভাষায় এর অর্থ আল্লাহ্র দেওয়া দান, যা সম্পূর্ণ মুক্ত, অবারিত অনুগ্রহ। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে কারামত হলো :- মহান আল্লাহ্তাআলা তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের থেকে এমন কিছু কাজ প্রকাশ করেন, যা দ্বারা তিঁনি তাদের সম্মানিত করেন, যা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক। নবী-রাসুলদের পরেই এই বান্দাদের মর্যাদা- যাদের ওলি, পীর বা মোর্শেদ, আওলিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কারামত কখনও বান্দার নিজস্ব ক্ষমতা বা ইচ্ছায় সংঘঠিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছা ও তাঁর ক্ষমতায় বান্দার হাতে কারামত প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে বান্দা উপলক্ষ মাত্র। মূল ক্ষমতা ও ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহ্তাআলার। কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হয় এবং তাঁর থেকে অস্বাভাবিক কোন কারামত প্রকাশিত হয়।

পবিত্র কোরানুল মাজিদে আল্লাহ্পাক সূরা ইউনুসের ৬২ নাম্বার আয়াতে বলেছেন :- জেনে রাখ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র ওলি তাঁদের নেই কোনো ভয় এবং নেই কোনো চিন্তা। ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) 'আল ফিকহুল আকবর'-এ ওলির সংজ্ঞায় বলেছেন :- (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

:- ওলি ওই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্ তায়ালার জাত ও সিফাতগুলোর মারেফত তথা পরিচয় লাভ করেছেন। সাধ্যানুযায়ী ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত রয়েছেন। যাবতীয় কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও আনন্দ-উপভোগ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করেন এবং যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে যিনি আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় বান্দা অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র ওলি তাদের কারামত আল্লাহ্ পাকের জাত, সিফাত ও ইলমে মারফতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পবিত্র কোরানে আল্লাহ্তাআলা ওলিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা তওবার ১১৯নং আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। এখানে সত্যবাদী বলতে ওলিদের বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্তাআলার প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ নিদর্শন 'মোজেজা' ও 'কারামত'। মোজেজা প্রকাশ পায় নবী ও রাসুলদের মাধ্যমে, আর কারামত হক্কানি পীর, ওলি, আওলিয়ায়ে কেরামদের জন্য নির্ধারিত। তাই মুজেজা এবং কারামত উভয় আল্লাহ্র প্রতিনিধিগণ বা যত পীর বা ওলি, আওলিয়া নবী-রাসুলগণ সহ যুগে-যুগে, কালে-কালে যত মহাপুরুষগণ আসছেন বা আসবে তাঁদের জন্য নির্ধারিত। যেহেতু খাতামান নবুয়্যত বা নবীর আগমন আর ঘটবে না কিন্তু খাতামান রাসুল এই কথা কোরানের কোন আয়াতে আসে নাই। তাই বেলায়েতের যুগে এখন আল্লাহ্র ওলি, আওলিয়া রাসুলগণের মধ্য দিয়ে উক্ত বিষয় প্রকাশ ঘটে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কোন ব্যক্তি আমলের ক্ষেত্রে শরিয়তের খেলাপ করে সে যদি চেষ্টা-সাধনা করে কোনোরূপ অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করে তবে এটিকে কারামত বলে না। তাই যে অস্বাভাবিক কাজ প্রদর্শিত জাদুবিদ্যা, কাফের বা আমরা প্রচলিতভাবে দাজ্জালে যে অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে থাকি সেগুলো মোজেজা বা কারামতের অন্তর্ভূক্ত নয়। এসবকে 'এসতেদরাজ' বলে। জেনে রাখতে হবে, যাবতীয় ঐন্দ্রজালিক (ইন্দ্রজাল, ভেলকি, জাদুবিদ্যা, মায়াবিদ্যা, ভোজবিদ্যা, ম্যাজিক ইত্যাদি) উক্ত বিষয় থেকে ভিন্নতর।

তাহলে মোজেজা প্রকাশ পায় নবী ও রাসুলদের মাধ্যমে আর কারামত হক্কানি পীর বা মোর্শেদ, ওলি, আওলিয়ায়ে কেরামদের মাধ্যমে। অর্থাৎ যুগের ধারাহিকতার কারণে একটা থেকে আরেকটায় রূপান্তরিত ব্যবস্থা।

নবী-রাসুলগণ থেকে ওলি, আওলিয়া, পীর বা মোর্শেদ ইত্যাদিতে রূপান্তর এবং মোজেজা থেকে কারামতে রূপান্তর। জ্ঞানীগণের মতে যদিও ওলি আওলিয়াদের অলৌকিক কার্যাবলীকে কারামত বলে আর নবী-রাসুলদের অলৌকিক কার্যবলীকে মোজেজা বলে কিন্তু সুফিদের আকিদা একেশ্বরবাদ হওয়াতে মোজেজা হিসাবেই উপস্থাপন রইল। মূলে উনাদের তেমন পার্থক্য নেই। এটাকে যদি দ্বৈত নীতিতে কল্পনা করা যায় না। ইমাম গাজ্জালী (আঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে :- "আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম। আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজেই নিজের রূপে বিভোর হলাম। আমি কখনও ঈসা, কখনও মুসা, কখনও জাকারিয়া সর্বশেষ মোহাম্মদ রূপে অবতার হয়ে ধর্মকে সুন্দর সুশীল রূপে পরিচালিত করে আবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে এই দুনিয়াতে সমাসিন হয়েছি। কত মৃত্যুর যন্ত্রণা আমি বহন করে চলেছি।

তাই ওলিগণ যদি উক্ত মতার অধিকারী হোন তাহলে কিভাবে তাঁদেরকে নবী-রাসুলগণ থেকে পৃথক করা যাবে ? আল্লাহ্পাক বলেছেন জ্ঞানীর জন্য নিদর্শন রয়েছে, তাই জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট। নবী-রাসুলগণের আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরে অর্থাৎ স্রষ্টার একত্ববাদের কারিকুলামের বা হেদায়েতের বাণী প্রচার করতে এসে অসংখ্য মোজেজা স্থাপন করেছেন। যুগের ধারাবাহিকতায় ওলি, আওলিয়াগণের মাধ্যমে (মোজেজার রূপান্তরিত রূপ) কারামত পৃথিবীবাসীর নিকট উপস্থাপন হয়েছে। ইতিহাস এবং কালের সাক্ষীতে তা স্থানান্তরিত হয়েছে। মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিগণ (স্রষ্টা কর্তৃক) ঐশী ক্ষমতা দ্বারা মানুষকে অলৌকিক ভাব ধারাতে জ্ঞাত করেছেন। যা পরবর্তীতে কেউ করতে পারে নি এবং অক্ষমও বটে। এই ক্ষমতা সার্বজনীন বিদিত নয়। যুগের ধারাবাহিকতায় যেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তেমনি মোজেজাও পরিবর্তশীল দেখতে পাই। এই সকল ক্ষমতার উৎস মহান রাব্বুল আলাআমিন যাকে প্রদান করেন তিঁনিই এসকল দৃষ্টান্ত জানান দিতে সক্ষম হন। ওলিগণের কারামাত সুফি দার্শনিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। তিঁনি তদানীন্তন রাসুল কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় আইনের অনুশাসন মানতে বাধ্য থাকেন। কারামাত মোজেজার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং মোজেজার পৃষ্ঠপোষকতা করে। মনে রাখতে হবে যে, ওলিগণের কারামাত সেই নবীর (সাঃ) (আঃ) মোজেজারই প্রমাণ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া কারামতের বাস্তবতা সম্পর্কে বলেন, "পূর্ণতা মূলত তিনটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। ১. ইলম বা জ্ঞান ২. কুদরত বা ক্ষমতা। ৩. গিনা বা অমুখাপেক্ষীতা। এই তিনটি বিষয়ের পরিপূর্ণতা একমাত্র আল্লাহ্‌র রয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ইচ্ছায় কোন বান্দাকে এই তিনটি বিষয়ের কিছু অংশ কারামত হিসেবে দান করে থাকেন। ইলম বা জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট কারামতের উদাহরণ হল, কেউ এমন কিছু শ্রবণ করা যা অন্য কেউ শোনে না। জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় এমন কিছু দেখা, যা অন্যরা দেখে না। অহি (নবীদের ক্ষেত্রে) বা ইলহাম (ওলিদের ক্ষেত্রে) এর মাধ্যমে এমন কিছু জানা, যা অন্যরা জানতে পারে না। অথবা কারও উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম অবতীর্ণ হওয়া। অথবা এমন বিচক্ষণতা যা আল্লাহ্‌তাআলা দান করে থাকেন। এগুলোকে কাশফ ও মোশাহেদা (অদৃশ্য বা গায়েবী বিষয় অবলোকন), মোকাশাফা (অদৃশ্য বিষয় উন্মোচন), মোখাতাবা (অদৃশ্য কথোপকথন) ও বলা হয়ে থাকে। কুদরতের সাথে সংশ্লিষ্ট কারামতের উদাহরণ হল, কোন কিছুর উপর তা'সীর বা ক্ষমতা প্রয়োগ। কখনও এটি মনোবল, সত্যবাদীতা বা দোয়া কবুলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কখনও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাজটি সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির নিজস্ব প্রভাব থাকে না। যেমন, কোন ব্যবস্থা নেয়া ছাড়াই শত্রু মৃত্যুবরণ করা। যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, যে আমার ওলির সাথে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। একইভাবে কোন বুজুর্গের প্রতি কারও মনকে আকৃষ্ট করে দেয়া বা তার মহব্বত কারও অন্তরে সৃষ্টি করা। এসকল ক্ষেত্রে বুজুর্গের কোন নিজস্ব প্রভাব থাকে না। একইভাবে কাশফের কিছু বিষয়ও কুদরতের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন বুজুর্গের বিভিন্ন হালত অন্যের সামনে প্রকাশিত হওয়া"। (আল-মোজেজা ওয়াল কারামত, পৃঃ ৯-১০-১১)

দার্শনিক ইবনে সীনার দৃষ্টান্ত থেকেও কারামতের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব "অপরিহার্য ও আত্মসচেতন ইচ্ছাসম্পন্ন" উদ্ভবের অস্তিত্বমূলক অদৃশ্যবাদের মধ্যে মোজেজা ও কারামতকে তিনি স্থান দিয়েছেন। নবীগণ তাদের মানবীয় প্রকৃতির পরিপূর্ণতা ও বাহ্যিক বস্তুনিষ্ঠার উপর প্রকৃতিগত আত্মিক প্রভাবেই মোজেজা দ্বারা তাঁদের আগমনকে নিশ্চিত করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, ইবন রুশদ তার "তাহাফুতুত তাহাফুত" গ্রন্থে একটি পার্থক্য উল্লেখ করেছেন তা হলো, যার মধ্যে গুণগত পার্থক্য নিহিত শুধু সেগুলোই -

অলৌকিক ঘটনা। কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব। তার রিসালা ফি আকসামিল উলুম গ্রন্থে ইবনে সিনা বলেন, কারামাত প্রকৃতিগতভাবে মোজেজার সমার্থক। তার ইশারাত গ্রন্থে তিনি এ কথা সমর্থন করেন যে, আধ্যাত্মিক গভীরতার কল্যাণে যার আত্মা জাগতিক বস্তুর উপর প্রভাবশীল এবং যিনি এই প্রভাব কল্যাণকর ও নীতিসিদ্ধ পন্থায় ব্যবহার করেন, যদি তিঁনি নবী হোন তাহলে আল্লাহ্'র দান হিসেবে তিঁনি তা লাভ করেন, সেটিই মোজেজা। আর যদি তিঁনি ওলি হোন, তাহলে তিঁনি কারামাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

কোরানুল মাজিদ থেকে এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু আয়াত পেশ করা হলো ঃ-

কোরানুল মাজিদের সূরা মমিনের-এর ৭৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেন :- "আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি, তাঁদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করি নি। আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রাসুলের কাজ নয়, যখন আল্লাহ্র আদেশ আসবে তখন ন্যায় সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। এবং অপর আরেকটি সূরায় (আনআম-এর ১০৯ নাম্বার আয়াতে) আল্লাহ্পাক বলেন :- তারা জোর দিয়ে আল্লাহ্র কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি বলে দিন! অলৌকিক নিদর্শনাবলী তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ, তোমাদেরকে কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই ?"। উক্ত আয়াতে কারিমাতে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর নিকট বিভিন্ন সময়ে কাফেররা এসে স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বিভিন্ন আবদার রাখত যাহা অলৌকিক মোজেজা ছাড়া কার্যকর সম্ভব নয়। এমন ধারাবাহিকতায় প্রিয় হাবিবকে (সাঃ) (আঃ) অহির মাধ্যমে জানান দিলেন যে, অলৌকিক বিষয় বা মোজোজা তো আল্লাহ্র কাছেই বা নিয়ন্ত্রণ করেন। তিঁনি যখন মোজেজা দেখানোর দরকার মনে করবেন তখনই তা দেখানো হবে। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্ম বা সত্যকে তুলে ধরার প্রমাণ হিসেবেই সাধারণত মোজেজা দেখানো হয়ে থাকে। জনগণের খেয়াল-খুশি বা কল্পনা-বিলাসকে পরিতৃপ্ত করার জন্য মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনা দেখানো হয় না। খোদাদ্রোহী মহলের মিথ্যাবাদীরা যত কঠিন শপথই -

করুক না কেন তা তাদের কথায় কুফরির মূল উৎস হল, অন্ধ-বিদ্বেষ ও গোড়ামী। তাই কাফেররা সব ধরনের অলৌকিক নিদর্শন বা মোজেজা দেখার পরও সত্যকে মেনে নিতে রাজি হয় না।

সূরা আল-ইমরান (আয়াত নাম্বার ৩৭) :- "যখনই হযরত জাকারিয়া (আঃ) মারিয়মের কক্ষে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, তখনই তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেতেন। তিঁনি বলতেন হে মারিয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে ? সে বলতো এগুলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন"। সন্দেহাতীতরূপে ঘটনাটি ছিল বিস্ময়কর, অলৌকিক। ঈসা (আঃ)-এর মা মারিয়াম নিজে কোন নবী ছিলেন না, নবুয়্যতের দাবীদারও ছিলেন না, অথচ তার কাছে পাওয়া যেতো অসম মৌসুমে মৌসুমী ফল। নারীও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এতদূর উন্নতি লাভ করতে পারে যে, আল্লাহ্‌র নবী পর্যন্ত তাতে বিস্মিত হন।

সূরা আল-কাহফের ৯ নাম্বার আয়াতে আলাহ্‌পাক বলেছেন :- "তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ?"। অর্থাৎ এই একটাই বৃহৎ ও বিস্ময়কর নিদর্শন নয়, বরং আমার প্রতিটি নিদর্শনই বিস্ময়কর। আসমান ও জমীনের এই সৃষ্টি, তার ব্যবস্থাপনা, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রকে আয়ত্তাধীন করা এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন ও অন্যান্য অসংখ্য নিদর্শন কি কম বিস্ময়কর ? যারা একটি পার্বত্য গুহাতে একাধারে তিনশত বছর ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, তাঁরা নবী-রাসুল নন! অথচ এ সকল ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘটনা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অলৌকিক নিদর্শন।

সূরা আন-নামল-এর ৪০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন :- "কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো একজন বলল, আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন সিংহাসনটি তার সামনে দেখতে পেলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ"। অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আঃ) অল্প সময়ের মধ্যে বিলকিসের সিংহাসন ইয়েমেন থেকে সিরিয়ায় আনতে বললে দরবারে উপস্থিত দু'জন এ কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরমধ্যে একজন ছিল জ্বিন এবং ওই জ্বিন হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে কাজ করতো। সে বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই বিলকিসের সিংহাসন আপনার সামনে এনে দেব এবং অন্য

একজন ছিলেন সুলায়মান (আঃ)-এর মন্ত্রী, যিনি সুলায়মান (আঃ)-এর পর্দা গ্রহনের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি চোখের পলকে বিলকিসের সিংহাসন আনতে পারবেন বলে জানান। সুলায়মান (আঃ) ঐ মন্ত্রীর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রীকে বিলকিসের সিংহাসন আনার নির্দেশ দেন। আর ঐ মন্ত্রী অল্প সময়ের মধ্যেই বিলকিসের সিংহাসন সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে হাজির করেন। মানুষ ঐশী জ্ঞান ব্যবহার করে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যারা কোন নবী ছিলেন না যিনি চোখের পলকে রানী বিলকিসের বিরাট সিংহাসন এনেছিলেন অনেক দূর থেকে।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল হাজা হাবিবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্লাহ শাহান শাহে ওলি আফতাবে ওলি সুলতানুল হিন্দ হিন্দাল ওলি আতায়ে রাসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ শেখ সৈয়দ মাওলানা মঈনউদ্দিন হাসান সানজারী আল-হুসায়েনী ওয়াল-হাসানী (আঃ)-এর রওজাতে একজন আশেক থাকতেন। তিনি তার মেয়ের বিবাহের বাবদ ৫০০ রুপিয়া খাজা বাবার রওজাতে বিনয়ের সহিত চাইতে লাগলো, এদিকে বিয়ের দিনক্ষণ উপস্থিত কিন্তু টাকা না পাওয়াতে আশেকের মনে সংশয় সৃষ্টি হলো। তিনি নিরুৎসাহিত হয়ে একটি লাঠি দ্বারা রওজা শরীফে ৩টি আঘাত করলো এবং বলতে থাকলো তুমি দাতা নও, আমার ফরিয়াদ তোমার কাছে পৌঁছায় নি! এভাবে ধৈর্যহারা হয়ে তিনি রওজা ত্যাগ করিল এবং কিছুদূর যাবার পর তিনি দেখতে পেলেন এজন মজ্‌যুব ছালা গায়ে তার নিকট এসে বলিল বাবা তোমার মেয়ের বিয়ের জন্য এই নাও ৫০০ রুপিয়া। মজ্‌যুবের কথাতে তিনি বিস্ময়ে আঁতকে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং গায়ের ছালাটি সরিয়ে দিয়ে দেখতে পেলেন ৩টি আঘাতের চিহ্নে লাল আবরণে ফুটে উঠেছে তাঁর পিঠ মোবারকে, তখন আশেকের বুঝতে আর বাকী রইল না (সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ রাখলাম)।

কোরানুল মাজিদে উল্লেখ শত, সহস্র মোজেজা দেখালেও যারা ইমান আনবে না তারা ভিন্নতার যুক্তি উপস্থাপন করে পাশ কেঁটে যাবে। যেমন আবু জাহেল ৩৬০ জন জাদুকরের উদ্দেশ্য বলেছিলো :- তোমাদের জাদু জমীনে চলে আর মোহাম্মদের জাদু আসমানেও চলে (নাউজুবিল্লাহ্)। এজন্য কালামপাকে উল্লেখ করা হয়েছে যে :- কে বলিল যে তারা ইমান আনিবে বা বিশ্বাস স্থাপন করিবে। অর্থাৎ এভাবে বিভিন্ন সময়ে মুশরিকগণ প্রিয় হাবিব (সাঃ) (আঃ)-কে -

জালাতন করেছেন, যে কারণে আয়াতে কারিমা দ্বারা আল্লাহ্পাক রাসুল (সাঃ) (আঃ)-কে জানান দিলেন। এ প্রসঙ্গে কোন এক সাধক তাঁর রচনাতে উল্লেখ করেছেন :- "ভালাবাসো সকলেরে কোরো না বিশ্বাস, বিশ্বাসের ভিতরে থাকে বিপদের আভাস"। তাই একনিষ্ঠতা ব্যতীত বিশ্বাসের কার্যকারিতা খুবই কম, সবাইকে ভালবাসাতে অগ্রগামী হওয়া সাধকে জন্য বাঞ্চনীয়।

মূল কথা হলো পানি যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। গ্লাসে রাখলে - গ্লাসের পানি, বালতিতে রাখলে বালতির পানি, পুকুরে রাখলে পুকুরের পানি, নদীতে রাখলে নদীর পানি, সমুদ্রে রাখলে সমুদ্রের পানি। স্রষ্টার সান্নিধ্যে অবস্থান এবং একনিষ্ঠতা অর্জন বিষয়ে স্রষ্টার সঙ্গে সাধকের মিলিত কার্যকরি রূপের প্রকাশ স্রষ্টা কর্তৃক মোজেজার মাধ্যমেও বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। একেরই প্রকাশ, একেরই বিকাশ, একেরই ছুটে চলা বহুগুণের বিকাশ, সকল কিছুতে স্রষ্টার কার্যকরি রূপ প্রকাশ তাঁর প্রতিনিধির দ্বারা, সেটাই মোজেজা বা কারামত হিসাবে যুগে-যুগে, কালে-কালে সাক্ষ্যতা বহন করে চলেছে। আধ্যাত্মিকতা যে অস্বীকার করা যায় না তা মোজেজার মাধ্যমে প্রকাশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সবার ভাগ্যে এটা মিলে না, আবার মিললেও কার্যকারিতার দিকে মনোনিবেস করতে পিছু পা হয়। এটাই হয় তো তকদির। সৃষ্টি কর্তারই অমোঘ লীলা-খেলাতে সমাসীন।

এভাবে অসংখ্য মোজেজা বা কারামত ওলিদের দ্বারা রচিত হয়েছে। তাই আল্লাহ্র যাঁরা বন্ধু হন তাঁদের দ্বারা আল্লাহ্ অলৌকিক নিদর্শন সমূহ দর্শন করান এটা কালামপাকের কথা। তাই ওলি, আওলিয়াগণকে আল্লাহ্র থেকেই মোজেজা বা কারামাত উপস্থাপন হয়ে থাকে।

নিম্নে আরও কিছু মোজেজা ও কারামত তুলে ধরা হলো ঃ-

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন "আল্লাহ্র ওলি-আওলিয়াদের মধ্যে দুইটা অতি ধারালো খোলা তরবারি আছে। একজন হলো :- গাউসে খোদা মুশকিল কুশা গাউসুল আজম রইসুল আরেফিন পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসে সামদানি শেখ সৈয়দ মওলানা মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী আল-হাসানী ওয়াল-হুসায়েনী (আঃ) এবং আরেকজন হলো তাঁহার নাতি আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরী (আঃ)।

বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)

লৌহে-মাহফুজ বিষয় এর স্বাক্ষরতা :-

এক বর্ণনায় লেখা আছে যে শায়খ আবুল হাফস (রহঃ) বলেছেন :- "আমাদের শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (আঃ) বাতাসে উড়াতেন এবং বলতেন, 'আমার দরবারে সালাম উপস্থাপনের আগে সূর্য ওঠে না। আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও সম্মানের কসম! সমস্ত ভাল মন্দ লোক আমার দৃষ্টির সামনে। আমার চোখ দৃঢ়ভাবে লৌহে-মাহফুজের উপর স্থির। বারবার আমি নিজেকে আল্লাহ্‌র দ্বারা অনুগ্রহ করে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমুদ্রে নিমজ্জিত করি এবং আমি মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন (নিশান) এবং আমার পূর্বপুরুষ নবী মুহাম্মদের বিশেষভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধি, আর আমি তাঁর দাস এই পৃথিবীতে।

একজন চোর আবদাল হয়ে ওঠেন :-

একবার শায়খ আবদ বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর বাড়িতে প্রবেশ করলেন চুরির অভিপ্রায় নিয়ে, ঘরে ঢুকেই সে অন্ধ হয়ে গেল এবং সে কিছুই দেখতে পেল না। তিনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না এবং অবশেষে তিনি বাড়ির এক কোণে বসলেন। সকালে ধরা পড়ে গেল শাইখ আবদ। যখন বড় পীর সাহেব তাকে দেখে, তিঁনি তাঁর হাত চোরের চোখের উপরে রেখেছিলেন চোরের দৃষ্টি অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। শায়খ আবদ তখন বলেছিলেন যে, "তিনি বস্তুবাদী (পার্থিব সম্পদ) চুরি করতে এসেছিলেন। বড় পীর সাহেব বলল! আমি তোমাকে এমন ধন দিয়ে আশীর্বাদ করব যে তা চিরকাল তোমার কাছে থাকবে। পরবর্তীতে বড় পীর সাহেবের দোয়ায় উক্ত ব্যক্তি আবদাল হয়ে উঠেন।

যুবতী মায়ের (ভক্তের) আর্তনাদে সাহায্য করা :-

বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর অনুসারী ছিলেন এক যুবতী তিনি সিলেনে বাস করত। একদিন একাকী একটি স্থানে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল, উক্ত ব্যক্তি যখন তাকে অসম্মান করতে চেয়েছিল, তখন অসহায় হয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমাকে বাঁচান হে আমার শায়খ আবদুল কাদির!" সেই মুহূর্তে শায়খ বাগদাদে ওযূ করছিলেন। লোকেরা তাঁকে থামতে দেখে।

বড় পীর সাহেব ক্রোধে তাঁর কাঠের জুতোটি ধরে নিক্ষেপ করেন। সেই জুতো উক্ত ব্যক্তির মাথায় পড়েছিল (যে সিলেনে মেয়েটিকে আক্রমণ করেছিল) এবং তাঁর জুতার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে উক্ত ব্যক্তি মারা যায়। সেই জুতোটি এখনও রিলিক হিসাবে সিলেনে রাখা রয়েছে।

সূর্যের রশ্মির আড়ালে লুকিয়ে থাকা :-

বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর লালন-পালনের দায়িত্বরত জৈনক মহিলা হতে বর্ণিত যে, সে যখন শিশু ছিল, তখন সে তাঁকে তার কোলে নিয়ে যেত কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেত যে সে আর নেই। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বড় পীর সাহেব আকাশে উড়ে এসে সূর্যের রশ্মির আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। যখন বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) বড় হয়েছিলেন, তখন উক্ত মহিলা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিঁনি এখনও ছোটবেলায় যেমন করতেন তেমনি এখনও করেন, অর্থাৎ সূর্যের আড়ালে এখনও কি লুকিয়ে থাকেন ? শায়খ বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) জবাব দিয়েছিলেন যে, "তখন আমি শিশু ছিলাম, এবং এটি দুর্বলতার সময় ছিল এবং আমি সূর্যের রশ্মিতে লুকিয়ে থাকতাম। এখন আমার শক্তি এবং শক্তি এত বিশাল, যদি হাজার হাজার সূর্য আসতে হয় তবে তারা আমার দ্বারা লুকিয়ে থাকার চেয়ে তারা সমস্তই আমার মধ্যে লুকিয়ে থাকত"।

ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্ন সম্পর্কে অবগত :-

একবার গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) একটি সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এই সমাবেশে বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর সামনে শেখ আলী বিন হাইতি (রহঃ) বসেন। মহান গাউসে পাকের বক্তৃতার সময় শেখ আলী বিন হাইতি (রহঃ) ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) এটি দেখে মিম্বার থেকে নেমে ঘুমন্ত শেখ আলী বিন হাইতি (রহঃ) এর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দু'হাত শ্রদ্ধার সাথে জড়িয়ে ধরেন। কিছুক্ষণ পর শেখ আলী বিন হাইতি (রহঃ) ঘুম থেকে উঠে দেখলেন বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)- তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শ্রদ্ধায় তাৎক্ষণিক ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) হেসে বললেন :- "আমি তাঁর সামনে যে কারণ দাঁড়িয়ে আছি তা হলো, তিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্বপ্নে দেখছিলেন এবং আমি নবীকে (সাঃ) (আঃ) আমার শারীরিক চোখ দিয়ে দেখছিলাম"।

আল্লাহ্‌র ফেরেস্তাদের গায়েবী আওয়াজ :-

ইসলামী পন্ডিতদের দৃষ্টিকোণ থেকে একথাও জানা যায় যে, তাঁকে প্রথমে শিক্ষার উদ্দেশ্যে মক্তবে পাঠানো হলে যাত্রাপথে একদল ফেরেশতা এসে তাঁকে বেষ্টন করে রইলেন এবং তাঁকে বেষ্টন করে শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। এ কথাও অনেকে বলে থাকেন যে, গাউসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-কে যখন মক্তবে নিয়ে যাওয়া হয় তখন মক্তবে ছাত্রদের সংখ্যা অনেক ছিল। বসার কোনো স্থান না থাকায় তিঁনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁর সঙ্গী ফেরেশতারা গায়েব হতে আওয়াজ দিলেন, "তোমরা বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের প্রিয় বান্দার বসার জন্য জায়গা করে দাও। সত্যি এহেন অদৃশ্য বাণী শুনে শিকক্ষ-ছাত্ররা চমকে উঠেছিলেন। পরবর্তীতে ছাত্ররা গাউসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-কে জায়গা করে দিলেন।

স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বের আগাম সংবাদ :-

তিঁনি শৈশবকালে যখনি খেলাধুলার মনোনিবেশ করতে আগ্রহী হতেন তখনি একটি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেতেন, "হে মোবারক শিশু আমার দিকে এসো! অন্যত্র বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ) নিজে বর্ণনা করেন, "রাত্রিকালে যখনি আমি অসাবধানতাবশতঃ নিদ্রায় অভিভুত হয়ে পড়তাম তখনি এ বাণী আমার অন্তরে প্রতিধ্বনি হত যে, হে আব্দুল কাদের, ঘুমাবার জন্য তুমি দুনিয়াতে আসনি বরং ঘুমন্ত ও মোহান্বিত মানবকুলকে জাগ্রত করার জন্য তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

হযরত আলাউদ্দিন আহমদ কালিয়ার সাবেরী (আঃ)

বাবা হযরত আলাউদ্দিন আহমদ কালিয়ার সাবেরী (আঃ)-এর জীবনেও অনেক বিষ্ময়কর অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। বাবা হযরত আলাউদ্দিন আহমদ কালিয়ার সাবেরী (আঃ) বড় পীরের পর সবচেয়ে জালালি ফায়েজের আওলিয়া। বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানী (আঃ)-এর আপন নাতি। তিঁনি বড় পীর আব্দুর কাদের জীলানী (আঃ)-এর পর তিঁনি হলেন সর্বাধিক জালালি তবীয়তের আওলিয়া। তাঁহার কিছু অলৌকিক ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

স্ত্রীর গায়ে আগুন লাগা :-

বাবা সাবেরী (আঃ) সব সময় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এজন্য চারপাশে কি ঘটছে তা তাঁর কোন খেয়াল থাকতো না। একবার বাবা সাবেরী এর মায়ের অনুরোধে তার মামা শেখ ফরিদ (আঃ) তাঁহার নিজের কন্যার সাথে বাবা সাবেরীর (আঃ) বিয়ে দেন। কিন্তু বাসর রাতে যখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নিকট গমন করলে বাবা সাবেরী (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?" তাঁহার স্ত্রী বললেন, "আমি আপনার বিবি"। এই কথা শুনার পর বাবা সাবেরী (আঃ) জালালি হালে শুধু এতটুকু উচ্চারণ করলেন যে, "যে আল্লাহ্ লা-শারিক তাঁর আবার স্ত্রী কিভাবে থাকতে পারে" আর ইহাতে সাথে-সাথেই তাঁহার বিবির গায়ে আগুন লেগে যায়। ফলে তাঁহার বিবি আগুনে ঝলসে মারা যান। এতে তাঁহার মামা খুব কষ্ট পেলেও তাঁহার করার কিছুই ছিল না।

১২ বছর অনাহার :-

বাবা সাবেরী (আঃ)-কে তাঁহার মামা লঙ্গর খানা পরিচালনার দায়িত্ব দিলে তিঁনি একটানা ১২ বছর সেই লঙ্গর খানা থেকে কোন খাবার গ্রহন করেন নি। ইহাতে তাঁর দেহ কঙ্কাল-সার হয়ে গেলে তাঁর মামা শেখ ফরিদ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে আমি পুরো লঙ্গর খানার দায়িত্ব দিলাম, তবুও তোমার শরীরের এই বেহাল অবস্থা কেন ?" উত্তরে বাবা সাবেরী (আঃ) বললেন, আপনি আমাকে কেবল লঙ্গর খানা দেখা শুনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু সেখান থেকে খাবার খাওয়ার কোন অনুমতি দেন নি। তাই আমি এত দিন না খেয়ে কাটিয়েছি"। এই উচ্চ পর্যায়ের সততার কথা শুনে শেখ ফরিদ (আঃ) খুব অবাক হয়ে পড়েন।

সম্পূর্ণ কালিয়ার শহর ধ্বংস :-

তাঁহার পীর কেবলা অর্থাৎ আপন মামা হযরত শেখ ফরিদ (আঃ) তাঁকে খিলাফত দিয়ে কালিয়ার শহরের কুতুব (প্রধান ধর্মীয় নেতা) নিযুক্ত করেন। কিন্তু কালিয়ার শহরের কাজী তবারক তাঁকে সাধারণ এক রাস্তার ফকির ভেবে খুব তাচ্ছিল্য করে এমন কি মসজিদে নামাজ পড়ার সময় তাঁকে ঘাড় ধরে বের করে দেন। এতে বাবা সাবেরী (আঃ)-এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে তিঁনি

কেবল এতটুকুই উচ্চারণ করেন যে, “সব ধ্বংস হোক”। ফলে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সমগ্র কালিয়ার প্রদেশ ৫ মিনিটে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সেদিন ঐ কালিয়ার শহরে একটি গাছ ছাড়া আর কিছুই অক্ষত ছিল না। ভূমিকম্পে সেই গাছ অক্ষত থাকার কারণ হল, সেই গাছের নীচে কালিয়ার আসার পর বাবা সাবেরী (আঃ) কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে ছিলেন। আজও সেই গাছকে মানুষ পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে।

পূর্বে মাজার শরীফে কেউ প্রবেশ করতে পারত না :-

বাবা সাবেরী (আঃ)-এর পর্দা গ্রহনের পর তাঁহার মাজার শরীফের চারপাশে তিন গুন জালালি ভাব প্রকাশিত হতে শুরু করে। কেউ যদি মাজারে যাওয়ার চেষ্টা ১ মাইল দূর থেকেও করতো, তাহলে সাথে সাথে আকাশ থেকে বজ্র পাত হয়ে সে খন্ড বিখন্ড হয়ে যেত। কথিত আছে তাঁহার পর্দা গ্রহনের ৪০ দিন পর্যন্ত তাঁহার মাজার সিংহ পাহাড়া দিতে দেখা যেত। পরবর্তীতে তাঁর এক বংশধরের অনুরোধে তিঁনি তাঁহার জালালি ভাব ক্ষান্ত করে তাঁহার মাজার শরীফ সবার জন্য জিয়ারতের উপযুক্ত করে দেন।

মৃত ছাগলের কথা বলা :-

কাজী তবারক হিংসার বশবর্তী হয়ে বাবা সাবেরী (আঃ)-কে পরীক্ষা করবার জন্য জন সম্মুখে বাবা সাবেরী (আঃ)-কে বললেন যে, “আমার তিন মাস আগে একটি ছাগল হারানো গেছে, তুমি যদি তার খবর বলতে পার তাহলে আমি মেনে নিব তুমি সত্যি আল্লাহ্‌র ওলি”। বাবা সাবেরী (আঃ) এই কথা শুনে কেবল এই বলে ডাক দিলেন যে, “যারা কাজী সাহেবের ছাগল খেয়েছ তারা আমার সামনে হাজির হও”, সাথে-সাথে ২৭ জন লোক আপনা-আপনি বাবার সামনে হাজির হন। এরপর বাবা সাবেরী (আঃ) কাজী সাহেবকে তার ছাগলের নাম ধরে ডাক দিতে বললে, কাজী সাহবের ডাকে ২৭ জনের পেট থেকে ছাগল কথা বলা শুরু করে দিল। এই আশ্চর্য কারামত দেখে কাজী তবারক হিংসায় তাঁকে জাদুকর বলে আখ্যা দিলেন। এতে বাবা সাবেরী (আঃ) কিছুই মনে করলেন না।

কেউ সামান্য বেয়াদবি করলে তার নির্ঘাত মৃত্যু :-

আল্লাহ্পাক তাঁকে এতই জালালি স্বভাব দান করেছিলেন যে তিঁনি যদি মুখে একবার উচ্চারণ করতেন যে লোকটির আচরণ ভাল না, তাহলে সাথে সাথেই সেই লোকটি দুই খন্ড হয়ে যেত, তার আর প্রানে বাঁচার উপায় থাকত না।

জ্বীন-পরীর গায়ে আগুন লাগা :-

তাঁহার মাজার শরীফের ওপর দিয়ে জ্বীন পরীও যদি ভুলে অতিক্রম করে তাহলে তাদের গায়ে সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যেত।

সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ)

সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ (আঃ)-এর জীবনেও অনেক অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে তাঁর কিছু বিষ্ময়কর অলৌকিক ঘটনা তুলে ধরা হলো।

উট রকক্ষদের সাথে আজমির শরীফের অলৌকিক ঘটনা :-

খাজা সাহেব (আঃ) যখন তাঁর অনুসারীদের নিয়ে আজমির পৌঁছেছিলেন এবং অন্দরকোটের নিকটে শহরের প্রাচীরের বাইরে একগুচ্ছ ছায়াময় গাছের নীচে শিবির স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তখন রাজা পৃথ্বীরাজের উট-রক্ষীরা অহংকার করে তাঁর সেখানে থাকার বিষয়ে আপত্তি জানালেন। তারা জোড় দেখাচ্ছিল যে জায়গাটি রাজার উটের জন্য ছড়ানোর জায়গা, এখানে উটেগুলোই বসে থাকবে। তাই আপনাদের অবশ্যই অন্য কোনও জায়গায় চলে যেতে হবে, খাজা বাবা (আঃ) বললেন, তাহলে উঠগুলোই বসে থাক! তিঁনি আনাসাগর হ্রদের নিকটে অন্য জায়গায় সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে যখন রাজার উটগুলি তাদের চলাচল করার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উঠেনি, তখন সমস্যাটা রাজা পৃথ্বীরাজের নজরে এলো। উট রক্ষীরা সমস্ত ঘটনা রাজাকে জানালেন এবং তিনি বিষয়টা বুঝতে পারেন। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং খাজা গরীবে নেওয়াজকে (আঃ) রাজার উক্ত জায়গা থেকে সরানোর জন্য তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন খাজা সাহেব বললেন : "যাও, উটগুলি উঠে যাবে"। ফিরে এসে উটগুলি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল।

মাশকিজায় (জল বাহনের জন্য ছোট ব্যাগ) আনাসাগর :-

একবার আজমিরে, রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের সৈন্যরা তাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের ফলে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ)-এর অনুসারীদের আনাসাগরের হ্রদ থেকে জল দিতে অস্বীকার করেছিল। এর পরে খাজা সাহেব একজন অনুগামীকে হ্রদ থেকে একটি মাশকিজায় (জল বহনের জন্য একটি ছোট ব্যাগ যাকে আমরা প্রচলিত ভাবে ঘটি জেনে বা বলে থাকি) কিছু জল আনতে বললেন। তিনি মাশকিজা ভরাট করলে পুরো আনাসাগর হ্রদের জল অলৌকিকভাবে এতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই অলৌকিক ঘটনাটি শহরের এক অভূতপূর্ব বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) তখন আনাসাগর হ্রদ এর নিকটবর্তী একটি মন্দিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেখানে গিয়ে প্রতিমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল। সবাই তাঁকে বলেছিল একে বলা হয় দেবী দেবতা। খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিমা তাদের সাথে কথা বলেছে কিনা ? নেতিবাচক জবাব পেয়ে তিঁনি মুর্তিটি কলেমার আবৃত্তি করেন এবং এটিকে স্যাদি নামকরণ করে একটি মানুষের রূপে পরিণত করেন। এতে শহরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

মৃত দেহতে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া :-

একবার আজমিরের শাসক একজন নিরীহ ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়ে তার মাকে একটি বার্তা পাঠালেন যাতে তিনি এসে তার ছেলের লাশ সংগ্রহ করেন। কিন্তু তার মা সেখানে যাওয়ার পরিবর্তে অসহায় হয়ে শান্তির আশ্রয়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ)-এর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, "আহ! আমার সম্বল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, আমার সংসার নষ্ট হয়ে গেছে, ইয়া গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ), আমার একমাত্র ছেলে ছিল, সে নির্দোষ থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্মম শাসক ফাঁসি দিয়েছেন। এই কথা শুনে তিঁনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমাকে আপনার পুত্রের দেহের কাছে নিয়ে যান, অতঃপর তিঁনি সেই ছেলের মৃতদেহের কাছে এসে তার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, "হে মৃত ব্যক্তি! যদি শাসক আপনাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় তবে আল্লাহ্‌র আদেশে উঠে দাঁড়ান"। তারপর শরীরে কিছুটা আন্দোলিত বা সঞ্চালন হয়ে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি অর্জন করা :-

কথিত আছে যে একবার আওরঙ্গজেব আলমগীর হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজের (আঃ)-এর গৌরবময় মাজারে গিয়েছিলেন। সীমানার মধ্যেই একজন অন্ধ ভিক্ষুক চিৎকার করছিলেন, ইয়া খাজা গরীবে নেওয়াজ! আমার দর্শনের জন্য চোখে দৃষ্টি পুনরুদ্ধার করুন। তিনি এই ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা! দর্শনের জন্য খাজা গরীবে নেওয়াজের (আঃ)-এর গৌরবময় মাজারে এরকম করে কতদিন বলেছেন ? তিনি বলেছিলেন যে এটি যুগে-যুগে হয়েছে তবে আমার ইচ্ছাটি এখনও পরিপূর্ণ হয় নি। তিনি বলেছিলেন যে পবিত্র মাজারে শ্রদ্ধাভরে নিবেদন করার পরে আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসব, যদি আপনার চোখ খুব ভালভাবে দৃষ্টি অর্জন করলে করবে, অন্যথায় না করলে আমি আপনাকে হত্যা করব। এই কথা বলার পরে রাজা ভিক্ষুকের দিকে নজর রাখার জন্য রক্ষীদের নিযুক্ত করলেন, এবং রাজা তার শ্রদ্ধা জানাতে ভিতরে বললেন। অন্যদিকে, ভিক্ষুক বিলাপ শুরু করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করলেন, "ইয়া খাজা! প্রথমে চুক্তিটি কেবল চোখের ছিল কিন্তু এখন এতে জীবন জড়িত, আপনি দয়া না দেখালে আমাকে হত্যা করা হবে"। রাজা যখন শ্রদ্ধা জানার পরে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর চোখ দৃষ্টি শক্তি বা দর্শন পেয়েছিল। রাজা হেসে বলেছিলেন যে, এখন অবধি আপনি হৃদয় ও মনোনিবেশ ব্যতীত খাজা বাবা (আঃ)-এর কাছে বলেছিলেন, এবং এখন জীবনের ভয়ে আপনি হৃদয় থেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাই আপনার প্রার্থনা গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনউদ্দিন (আঃ) পূর্ণ করেছে।

একজন আশেকের জন্য দয়া :-

একদিন খাজা সাহেবের 'মুরিদ' (শিষ্য) তাঁর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, নগরীর গভর্নর খুবই অসহনীয় হয়রানির দ্বারা আমার জীবনকে অতি দুর্বিষহ করে তুলেছেন যে, আজ সে শহর থেকে আমার বিতাড়িত করার আদেশ দিয়েছে"। জবাবে খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) বললেন, "তবে এখন সে কোথায়, তাকে ইতিমধ্যে আল্লাহ্পাক শাস্তি দিয়েছেন"। ঐ গভর্নর নিজের বাড়িতে ফিরে এসে শিকার করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে আকস্মিক মৃত্যুর ঘটেছে।

অপরিপক্ক গরুর থেকে দুধ পান :-

একবার খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) আজমীরের আনাসাগর হ্রদের তীরে বসে ছিলেন। একজন রাখাল ছেলে তার আগে আগে গরুর একটি পাল নিয়ে যাচ্ছিল, গরুপাল এখনও তাদের পরিপক্কতা অর্জন করতে পারেনি। খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) ছেলেটিকে তার পালের গরু থেকে কিছু দুধ চেয়েছিলেন। ছেলেটি এটাকে রসিকতা হিসাবে নিয়ে বলল, "বাবা তারা সবাই অপরিণত বয়সের বাছুর; তারা এই বয়সে কোনও দুধ দেয় না। খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) হাসলেন এবং একটি গরুর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আমি ঐ গরুর দুধ পান করতে চাই, তার কাছে গিয়ে দুধ খাব"। ছেলেটি দ্বিধায় পরে গেল। তারপরে যখন তিঁনি এই নির্দিষ্ট গাভী থেকে দুধ খেতে গেলেন, তখন তিঁনি কেবল তার দুধগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকাশিত এবং দুধের সাথে অতিরিক্ত প্রবাহিত পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। ছেলেটি দুধের সাথে বেশ কয়েকটি অভ্যর্থনা পূর্ণ করেছিল যা ৪০ জন তাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে পান করেছিলেন। ছেলে এই অলৌকিকতায় অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) মহান ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ)-এর একটি দর্শন :-

একদিন মহান খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতী (আঃ) বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতারা লক্ষ্য করেছেন যে তিঁনি যখনই তাঁর ডানদিকে ঝুঁকছেন, তখন তিঁনি কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন এবং তারপরে আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। এটি অনেকবার ঘটেছিল। বক্তৃতার পরে, কিছু ভক্ত তাঁকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তিঁনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তাঁর পীর-ও- মোর্শেদের সমাধিটি সেই পাশে ছিল এবং যখনই তিঁনি সেই দিকটি দেখেন তখন সমাধিটি তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত হত, তাই তিঁনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শ্রদ্ধা জানাতে।

মওলা আলীর (আঃ)

রাসুল (সাঃ) (আঃ) আমি এবং আলী (আঃ) একই নূরে দুইটি টুকরা। মওলা আলী (আঃ)-এর জীবনে অনেক বিষ্ময়কর অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। তাঁর কিছু অলৌকিক বিষয় তুলে ধরা হলো :-

পবিত্র কাবা ঘরে জন্ম :-

পবিত্র কাবা ঘরকে আল্লাহ্‌র ঘর বলা হয়। একমাত্র মওলা আলী (আঃ)-এর জন্ম পবিত্র কাবা ঘরে। হযরত আলী (আঃ) মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় মায়ের প্রসব বেদনা উঠলে তিঁনি পবিত্র ক্বাবা গৃহে চলে যান এবং কাবা গৃহের দেয়ালের নিকট বসে পড়েন এবং আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন :- হে প্রভু! আমি তোমার প্রতি, তোমার পক্ষ থেকে নাজেলকৃত সকল কিতাবের প্রতি এবং এ ঘরের পুনঃনির্মাতা মুসলমানদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর কথার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখি। হে প্রভু! এ ঘরের নির্মাতার সম্মানে এবং আমার পেটে যে শিশু আছে তাঁর ওসিলায় এ শিশুর জন্মদান আমার জন্য সহজ করে দাও"। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর পবিত্র কাবা গৃহের দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হল এবং তিনি ঐ ফাটলের পথ দিয়ে কাবা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্রই ফাটলটি পুনরায় জোড়া লেগে গেল। তখন ওখানে উপস্থিত অন্যান্যরা কাবা গৃহের দরজা শত চেষ্টা করেও খুলতে পারলেন না। সবাই বুঝে গেলেন যে, এটা মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ হিকমত।

অবশেষে চারদিন পর পবিত্র কাবা গৃহের পূর্বের ফাটলকৃত জায়গার মধ্য দিয়ে হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ এক পবিত্র নবজাতকসহ পবিত্র কাবা গৃহ থেকে বের হয়ে আসলেন। নবজাতক সহ বের হয়ে আসা মাত্র পুনরায় কাবা গৃহের ফাটলকৃত অংশটি পূর্বের মত জোড়া লেগে গেল। মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে শিশুটির নাম ঠিক হল "আলী"। যে নাম জগতে ইতিপূর্বে কেউই রাখে নি। পবিত্র কাবা গৃহের অভ্যন্তরেই ইমাম আলী (আঃ) জন্মগ্রহন করেন। (সূত্র-কাশাফুল গ্‌বাম্মাহ, ১ম খন্ড, পৃ- ৯০)।

ভূমিকম্পকে থামিয়ে দেওয়া :-

একবার বেশ কিছু সময় ধরে ভূমিকম্প হতে থাকলে ও পাহাড়গুলো কাঁপতে থাকলে লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মওলা আলী (আঃ)-এর স্মরণাপন্ন হন। মওলা আলী (আঃ) সে সময় খলিফা ছিলেন না। তিঁনি ভূমিকে লক্ষ্য করে বলেন; "তোমার কি হলো ? শান্ত হও"। ফলে ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বিস্মিত লোকজনকে লক্ষ্য করে তিঁনি বলেন: "আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন:- "যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে। এবং মানুষ বলবে, এর কি হল ? আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন জমিনকে বলবো, তোমার কি হলো? (এরপর কোরানে এসেছে) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ফলে আমার জন্য খবরগুলো বর্ণনা করবে জমিন।"

সাধারণ পাথরকে মূল্যবান পাথরে রূপান্তর করা :-

একবার আলী (আঃ) একদল সঙ্গীসহ কুফার মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি ইমাম আলী (আঃ)-কে বলেন; আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমি বিস্মিত যে এই দুনিয়া দুই গ্রুপের হাতে রয়েছে এবং আপনি এই দুনিয়া থেকে কিছুই পাচ্ছেন না! আলী (আঃ) বললেন, তুমি কি মনে কর আমরা {(বিশ্বনবীর (সাঃ) (আঃ) আহলে বাইত)} যদি দুনিয়াকে চাইতাম তাহলে কী আমাদের দেয়া হত না ? এরপর তিঁনি এক মুঠো পাথরের কণা হাতে নিয়ে সেগুলোকে মূল্যবান পাথরে পরিণত করে প্রশ্ন করেন, এসব কি ? লোকটি বলল: সবচেয়ে মূল্যবান পাথর। আমরা দুনিয়া চাইলে তা দেয়া হয়, কিন্তু আমরা তা চাই না। এ কথা বলে তিঁনি সেগুলো দূরে ফেলে দেন এবং সেগুলো আবারও সাধারণ পাথরের কণায় পরিণত হয়!

কবরস্থানের পর্দা উন্মোচন :-

মওলা আলী (আঃ)-এর একদল সঙ্গী তাঁকে বললেন :- মুসা ও ঈসা নবী জনগণকে অনেক মোজেজা দেখিয়েছেন। আপনিও যদি সে ধরনের কিছু দেখাতেন তাহলে আমাদের হৃদয় সুনিশ্চিত হত। মওলা আলী (আঃ) বললেন; তোমরা এ জাতীয় নিদর্শন দেখা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু তারা বার বার একই অনুরোধ করতে থাকায় তিঁনি এক শুষ্ক উপত্যকায় একটি কবরস্থানের দিকে তাদের নিয়ে যান।

সেখানে তিঁনি দোয়া পড়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, তোমার পর্দা সরিয়ে ফেল। ফলে হঠাৎ কিছু বাগান ও নহর বা খাল দেখা গেল একদিকে এবং অন্যদিকে জাহান্নামের আগুন দেখা যাচ্ছিল। একদল বলে উঠলো জাদু জাদু। কিন্তু অন্য একদল এই মোজেজাকে বিশ্বাস করে বললেন, বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন :- কবর হচ্ছে বেহেশতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত।

বৃষ্টি বর্ষণ :-

একবার জনগণ বৃষ্টির অভাবে মওলা আলী (আঃ)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করায় তিঁনি দোয়া করলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। এতো বৃষ্টি হলো যে এবার জনগণ বলতে লাগলো খুব বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে তিঁনি আবারও দোয়া করায় বৃষ্টি কমে যায়। (সূত্রঃ বিহারুল আনোয়ার)।

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবিব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা :-

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য মোজেজার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিলো আঙুলের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করা। এটি কুরাইশদের সামনে ছিলো নবীজির নবুয়্যতের প্রমাণ এবং নবী বিদ্বেষীদের জন্য তাঁর উচ্চ মর্যাদার দলিল। অন্য কোন নবীর পক্ষ থেকে এর চেয়ে বিস্ময়কর কোন ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাটি নিম্নরূপ :-

হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে আবু জাহেল, ওলিদ বিন মুগীরাহ এবং আ'স বিন ওয়ায়েল প্রমুখ কাফিররা তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিখ্যাত জাদুকরদের সঙ্গে করে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, তুমি যদি সত্য নবী হও, তবে আকাশের চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দেখাও। কারণ জাদু - জমিনে চলে কিন্তু আসমানে চলে না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি এরূপ করে দেখাতে পারি, তবে কি তোমরা ঈমান আনবে ? উত্তরে তারা বললো- হ্যাঁ।

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন যেন চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীবের দোয়া কবুল করলেন। অতঃপর জিব্রাঈল মারফত তিঁনি চাঁদের দিকে আঙ্গুলি ইশারা করতেই তা দুই টুকরা হয়ে গেল। এবার তিঁনি কাফিরদের এক একজনের নাম নিয়ে ডেকে ডেকে বললেন, হে অমুক, সাক্ষী থাকো। সকল কাফিররা চাঁদের দ্বিখন্ডন ভালোভাবে দেখতে পেলো। চাঁদের খন্ড দুইটি পরস্পর থেকে এতো দূরে চলে গেলো যে এটার মধ্যদিয়ে হেরা পর্বত দেখা যাচ্ছিল। জাদুকরেরা সাথে সাথে রাসুলের (সাঃ) (আঃ) প্রতি ঈমান আনল কিন্তু কাফেরগণ অর্থাৎ আবু জেহেল এই ঘটনাকে অস্বীকার করলো, এটাকে নিছক জাদুক্রিয়া বলে মন্তব্য করলো এবং জাদুকরদের উদ্দেশ্যে বলল; তোমাদের জাদু জমিনে চলে কিন্তু মোহাম্মদের জাদু আসমানেও চলে। (নাউজুবিল্লাহ্)

ডুবন্ত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা :-

উর্দ্ধাকাশে নবীজির মোজেজার আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ডুবন্ত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা। ইমাম তাহাভী ও তাবরানী আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের কাছাকাছি সাহবা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় তাঁর উপর অহি নাজেল হয়। তিঁনি হযরত আলী (আঃ) জানুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত আলী (আঃ) তখনও আসর নামাজ পড়া হয় নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্রা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কায় তিঁনি নড়া চড়া করছেন না। সূর্য অস্ত গেলো। নবীজি নিজেই জাগ্রত হয়ে হযরত আলী (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আলী! আসরের নামাজ পড়েছো ? তিঁনি বললেন, না। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোনাজাত করলেন, হে আল্লাহ্! তোমার আলী, তোমার এবং তোমার রাসুলের আনুগত্যে ছিলো। অথচ আলী (আঃ)-তো শুধু নবীরই (সাঃ) (আঃ) আনুগত্য করছিলেন। অতঃএব, একথা পরিষ্কার যে রাসুলের আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য, রাসুলের প্রতি ভালবাসাই আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা, রাসুলের প্রতি শত্রুতা পোষণই আল্লাহ্র প্রতি শত্রুতা পোষণ।

এটা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একক মর্যাদা যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। নবীজির মোনাজাতের সাথে সাথে সূর্য আকাশে উদিত হলো। হযরত আলী (আঃ) তখন আসরের নামাজ আদায় করে নিলেন। হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন আমি সূর্যকে ডুবে যেতে দেখেছি, তারপর আবার সে সূর্যকে আকাশে উঠতেও দেখেছি। সূর্যের রশ্মি তখন পাহাড়ের চূড়ায় এবং জমীনে পতিত হয়েছিলো।

হযরত জাবেরের মৃত সন্তানদেরকে জীবিত করা :-

একবার সাহাবী হযরত জাবের দয়াল নবীজি কে ঘরে দাওয়াত করলেন। নবীজি সাহাবীর দাওয়াত কবুল করলেন। হযরত জাবের খুশীতে আত্মহারা হয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে খুশির খবরটা দিলেন আর মেহমানদারির জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। বড় ছেলে আবদুল্লাহকে নিয়ে খাসী জবাই করে অন্য কাজে যখন হযরত জাবের ঘর থেকে বাহিরে গেলেন, ইতিমধ্যে হযরত জাবের এর ছোট ছেলে ঘুম থেকে উঠে খাসী তাঁলাশ করতে লাগলো। বড় ভাই তাকে জানায় যে খাসীটিকে জবাই করা হয়েছে। ছোট ভাই বায়না ধরলো খাসী কিবাবে জবাই করে আমাকে তা দেখাও । বড় ভাই তাকে ঘরের পেছনে নিয়ে গিয়ে বললো, এখানে খাসী জবাই করা হয়েছে। ছোট ভাই জানতে চাইলো কিভাবে ? বর্ণনা করে বোঝতে না পেরে অবশেষে অজ্ঞতা বশত বড় ভাই বললো, তাহলে তুমি মাটিতে শুয়ে পড়, আমি তোমাকে দেখাই। ছোট ভাই মাটিতে শোয়ার পর বড় ভাই তার গলায় ছুরি চালিয়ে জবাই করার নমুনা দেখাতে গিয়ে ছোট ভাইকে সত্যি সত্যি জবাই করে ফেললো। বড় ভাই যখন দেখলো- ছোট ভাইয়ের গলা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, সে ছটফট করতে করতে এক সময় নিস্তেজ হয়ে গেছে, তখন বুঝলো ব্যাপারটি কি ঘটেছে। আতঙ্কিত হয়ে সে নিকটবর্তী এক খেজুর গাছের চূড়ায় উঠে আত্মগোপন করে রইলো।

এদিকে হযরত জাবের পুত্রদের খোঁজে বাড়ীর পেছনে এসে ছোট ছেলের অবস্থা দেখে থমকে গেলেন। অতঃপর তাকে বুকে করে স্ত্রীর কাছে গিয়ে গিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি একটি কম্বল নিয়ে এসো, বাচ্চাটিকে শুইয়ে দিই। স্ত্রী রক্তমাখা সন্তানের লাশ দেখে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

কিন্ত স্বামী হযরত জাবের তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, আজ আমাদের শোক প্রকাশ করার দিন না, আমাদের দুঃখ দেখলে নবীজিও দুঃখিত হবেন । অতএব ধৈর্য ধারণ করো। কষ্ট হলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলো। তারপর তারা দু'জনে মিলে ছোট ছেলেকে কম্বল মুড়ে রান্নাঘরের পেছনে রেখে আসলেন । স্ত্রী রান্নার কাজে মন দিলেন। হযরত জাবের বের হলেন বড় পুত্র আবদুল্লাহর খোঁজে। বাড়ীর পেছনে গিয়ে ছেলের নাম ধরে জোরে ডাক দিলেন। গাছের উপর আত্মগোপন করে বড় ছেলে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল আর ভয়ে কাঁপছিল। পিতার ডাক শুনে ভাবলো এখন পালাতে না পারলে আব্বার হাতে ধরা পড়তে হবে। ধরা পড়লে আর রক্ষা থাকবেনা। পালানোর উদ্দেশ্যে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। পিতা কাছে গিয়ে দেখেন, আবদুল্লাহর দেহে আর প্রাণের স্পন্দন নেই! বড় ছেলেকে কোলে তুলে তিনি বাড়ীর ভিতরে আসলেন। স্ত্রীকে বললেন, আরও একটি কম্বল নিয়ে আসার জন্যে। বড় ছেলের এই অবস্থা দেখে দরদী মা পুনরায় আর্তনাদ করে উঠলেন। স্বামী তাকে পুনরায় শান্তনা দিয়ে বললেন; ধৈর্য্য ধরো, আজ আমাদের দুঃখ প্রকাশের দিন না। আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন। দয়াল নবীজি (সাঃ) (আঃ) অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ঘরে তশরিফ আনবেন।

তারপর দু'জনে মিলে বড় ছেলের লাশও কম্বলে মুড়ে ছোট ছেলের লাশের পাশে রাখলেন। স্বামী-স্ত্রী তাদের চোখের পানি মুছে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেন। হযরত জাবের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে নবীজির (সাঃ) (আঃ)-এর আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে নবীজি (সাঃ) (আঃ)-কে উটের পিঠে করে আসতে দেখা গেলো। হযরত জাবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীকে নবীজির (সাঃ) (আঃ) আগমনের সংবাদ দিলেন। এবং পুনরায় তিনি দৌড়ে বাড়ীর সামনে চলে এলেন। নবীজির উটের কাছে গিয়ে তাঁকে বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে আনলেন নবীজি জাবের এর ঘরের সামনে উট থামিয়ে তাঁর ডান পা মোবারক মাটিতে রাখলেন, বাম পা মোবারক এখনো নামাতে বাকী। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্দেশ নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ্‌ আপনাকে জাবেরের ছেলেদেরকে সঙ্গে নিয়ে খানা খেতে বলেছেন।

অতঃপর নবীজি (সাঃ) (আঃ) সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে জাবের এর ঘরে তশরীফ নিলেন। তাদের সামনে জাবের দস্তর খানা বিছিয়ে দিলেন তার স্ত্রী খাবার বেরে দিলেন আর তিনি সেগুলো এনে মেহমানদের সামনে হাজির করলেন তারপর তিনি নবীজিকে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! দয়া করে খানা শুরু করুন নবীজি (সাঃ) (আঃ) বললেন, হে জাবের ! তোমার ছেলেরা কোথায় ? তাদেরকে ডাক হযরত জাবের বললেন, ইয়া হাবিবাল্লাহ! আপনি দয়া করে খেয়ে নিন ছেলেদেরকে আমি পরে ডাকবো হযরত রাসুল (সাঃ) (আঃ) পুনরায় বললেন তোমার ছেলেদের ডেকে নিয়ে এসো তাদেরকে সাথে নিয়ে খানা খাবো। হযরত জাবের ও তার স্ত্রীর হাত জোড় করে পুনরায় আরজ করলেন , ইয়া রাসূললুল্লাহ! আপনি খানা খেয়ে নিন আমরা তাদেরকে ডেকে দিচ্ছি। তখন নবীজি বললেন, হে জাবের ! এইমাত্র জিব্রাইল ফেরেশতা আমাকে আল্লাহ্র নির্দেশ জানিয়ে গেলেন, আমি যেন তোমার ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে খানা খাই। নবীজির একথা শুনে হযরত জাবের ও তার স্ত্রী আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেনা । তারা চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন, তখন নবীজি (সাঃ) (আঃ) হযরত জাবেরকে বললেন, তোমার ছেলেদের কাছে গিয়ে বল, আল্লাহ্র নবী (সাঃ) (আঃ) তাদেরকে ডাকছেন। হযরত জাবের নবীজির নির্দেশ মোতাবেক ছেলেদের লাশের সামনে গিয়ে তা বললেন, সঙ্গে তারা দু'জন আল্লাহু আকবর বলে উঠে নবীজির কাছে দৌড়ে চলে গেল। অতঃপর নবীজি আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক হযরত জাবের এর দুই সন্তানকে নিয়ে খানা খেলেন। সুবহানাল্লাহ (সূত্রঃ মাদারেজুন্নাবুয়াত - মোজেজাতুর রাসুল)

মহানবীর অলৌকিক মোজেজা দেখে ইহুদী পরিবারের ইসলাম গ্রহণ :-

মদীনার বুকে একজন জনসম্মুখে প্রিয় নবীজি হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ)-কে অপদস্থ করার এক কু-বাসনা নিয়ে নবীজির কাছে এসে বললেন, 'হে মোহাম্মদ, তুমি দাবি করেছো, তুমি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী এবং তোমার কাছে নাকি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহি (আল্লাহ্র বাণী) আসে।

তুমি যদি তোমার দাবীতে সত্য হও, তাহলে এমন কিছু করে দেখাও যা সাধারণ কারো পক্ষে সম্ভব না"। এই কথা শুনে তখন নবীজি (সাঃ) (আঃ) বললেন, ঠিক আছে কি দেখতে চাও তুমি-ই বল ? তখন সেই ইহুদী দূরের একটা গাছ কে দেখিয়ে বললো, দেখি এক মূহুর্তে কোন হাতের স্পর্স ছাড়া গাছটিকে এখানে হাজির করে দেখাও তো। তখন নবীজি (সাঃ) (আঃ) মুচকি হেসে বললেন, আমি কোন কিছুই বলবো না, তুমি-ই সেই গাছটির কাছে গিয়ে শুধু এতটুকু বল যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসুল (সাঃ) (আঃ) তোমাকে ডাকছেন। কথামত সেই ইহুদী তার মনের সেই কু-বাসনা পূর্ণ হওয়ার আশা নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে, গাছটির কাছে গিয়ে বললো, তোমাকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসুল (সাঃ) (আঃ) ডাকছেন। ইহুদী এই কথাটি বলার সাথে সাথেই, গাছটি কম্পন করতে আরম্ভ করে দিলো এবং মাটির সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে লাফিয়ে লাফিয়ে নবীজির (সাঃ) (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করলো। গাছের এই অবস্থা দেখে সেই ইহুদী অবাক হয়ে আবার বললো, দেখি গাছটিকে আবার তার সেই আগের জায়গায় প্রতিস্থাপন করে দেখান। তখন নবীজি (সাঃ) (আঃ) গাছটিকে বললেন, যাও তুমি তোমার নিজের স্থানে ফিরে যাও। সাথে সাথে গাছটি আবার তার পূর্বের স্থানে ফিরে গেলো। নবীজির এই অলৌকিক মোজেজা দেখে ইহুদী লোকটি সাথে সাথে উচ্চস্বরে কলিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো। এবং পরে তার পরিবারের সকল সদস্যকে মুসলমান করালো। (আবু দাউদ- নুজহাতুল মাজালিছ-হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামিন- ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

উটের সেজদা দেওয়া :-

ইমাম আহমদ এবং নাসায়ী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন :- আনসার গোত্রের প্রত্যেকেই উট পালন করতো। এক বাড়িওয়ালা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করলেন, আমার একটি উট রয়েছে যার পিঠে করে আমি পানি এনে থাকি। উটটি বড় বেয়াড়া হয়ে গিয়েছে, সে বোঝা বহন করতে চায় না। আর এদিকে আমার খেজুর বাগান পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে।

এ কথা শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে উটটির কাছে গেলেন। তিঁনি বাগানে পৌঁছালেন এবং একস্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাগানের এক কোণে বসা ছিলো উটটি। আনসারী লোকটি বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটাই আমার উট, যে কুকুরের মতো মানুষকে কামড়াতে চায়। আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আপনাকেও সে কামড়ে দেয়। নবীজি (সাঃ) (আঃ) বললেন, আমার ব্যাপারে ভয় করো না। তিঁনি উটের সামনে গেলেন। উটটি তাঁকে দেখা মাত্র মাথা উঠালো এবং তাঁর সামনে গিয়ে কদম মোবারকের কাছে মাথা নত করে সেজদা করলো। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটটির মাথার পশম ধরে টান দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন।

নবী (সাঃ) (আঃ) আঙ্গুলি মুবারক হতে পানির স্রোত :-

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়াতে একবার সাহাবায়ে কেরাম পিপাসায় কাতর হয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করলেন, সহযাত্রীদের কারো নিকট পান করার মতো পানির কোন ব্যবস্থা নেই। আপনি অজু করার পর বদনাতে যে সামান্য পানি পড়ে আছে এখন তাই শেষ সম্বল। একথা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্ত মোবারক বদনার ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙ্গুলী হতে পানির স্রোত বইতে লাগলো। সকল সাহাবা তৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করে অজু করলেন। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, সাহাবাদের সংখ্যা কত ছিলো ? তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা পনেরশ ছিলো বটে কিন্তু এই সংখ্যা যদি লক্ষও হতো তথাপি সকলের প্রয়োজন মিটাতে ঐ পানিই যথেষ্ট ছিলো।

সামান্য আহারে বরকত :-

খাবারে বরকত সংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে এসেছে। তার মধ্যে একটি হলো :- হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন।

কিন্তু যথা সময় নবীজি তাকে বললেন, বড় বড় দেখে ত্রিশ জন আনসারীকে দাওয়াত কর। নবীজির হুকুম অনুযায়ী ত্রিশজন আনসারী এসে খেয়ে গেল। অবশেষে দেখা গেল, ঐ দু'জনের খাবার হতে ত্রিশজন আনসারী তৃপ্তি সহকারে আহার করবার পরও খাবার বেঁচে গিয়েছে (বায়হাকী)। হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঐ সামান্য খাবার হতে ত্রিশজন আনসারী পেট ভরে আহার করলো এবং এই মোজেজা দেখে সকলে ইসলাম কবুল করে রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহন করলো। তিনি আরো বলেন, সেই দিন ঐ খাবার দ্বারা সর্ব মোট একশত আশিজন তৃপ্তি সহকারে আহার করেছিলো।

গাছ বা বৃক্ষের কান্না বিষয়ে :-

আবদুল্লাহ উমর বর্ণনা করেছেন যে :- নবী খেজুর গাছের কাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর খুতবা প্রদান করতেন। একজন মহিলার অনুরোধে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন যে তাঁর জন্য তিনটি ধাপের একটি ছোট ছোট মিম্বির নির্মাণ করা যাতে তিঁনি আরও বেশি দৃশ্যমান হন এবং ক্রমবর্ধমান শ্রোতাদের মধ্যে তাঁর কণ্ঠ আরও বিস্তৃত করতে পারেন। পরের শুক্রবার নবীজি (সাঃ) (আঃ) যখন নতুন মিম্বরে আরোহণ করলেন, তখন এই গাছের কান্ড থেকে কাঁদতে কাঁদতে জোরে জোরে শব্দ করে উঠল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচে নেমে এসে তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কেউ তার আপন সন্তানের শান্ত করার জন্য যেমন ভাবে তার উপর হাত বুলায় ঠিক তেমন করে হাত বুলাতে শুরু করলেন। অনেকে এর কান্নাকাটি শুনে এবং কান্নাকাটি করতে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। ইবনে আব্বাসের যোগ করেছেন, "তিঁনি গিয়ে এটিকে জড়িয়ে ধরলেন যতক্ষণ না শান্ত হয়, সেই গাছটি শান্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র হাবিব (সাঃ) (আঃ) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি যদি তার কান্না গ্রহন না করতাম তবে কিয়ামত অবধি এভাবে চলতে থাকতো"।

মোরাকাবা মোশাহেদা

মোরাকাবা অর্থ ধ্যান, মোশাহেদা অর্থ কোন সত্ত্বাকে পাওয়া। অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে কোন সত্ত্বাকে পাওয়া বা উপলব্ধি করার নাম মোরাকাবা মোশাহেদা। মোরাকাবা বলতে আকার আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু, মোশাহেদা বলতে ঐ বস্তুর উপর সুক্ষ্ম দৃষ্টি। মোরাকাবা বস্তুর প্রতি গভীর ধ্যান বা মনোযোগ বুঝায়।

"মোরাকাবা" দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মোর শব্দটি মোর + আ (প্রত্যয়) যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে যার অর্থ দাঁড়ায় আমার। আর কাবা অর্থ মক্কার অবস্থিত আল্লাহ্‌র ঘর তোলা অস্থাবরণ, আধ্যাত্মিক ভাবে শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল বা গন্তব্য স্থল। দুনিয়া বাসীর চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে স্রষ্টার দর্শনের আশায় একাগ্র চিত্তে নিমগ্ন বা ধ্যানস্ত হওয়ার নাম মোরাকাবা। আর ধ্যান করতে গেলে সুরত বা চেহারা প্রয়োজন, তাই পীরের চেহার বা সুরতে মশগুল থাকা মোরাকাবা। মোশাহেদা অর্থ দর্শন বা দেখা পীরের রূপ ব্যতীত কিছুই থাকে না (আমিত্ব হাস্তির)। কিছুই না থাকলে তখন বিশেষ কিছু আলামত বা নিদর্শন দেখা যায় তা হলো মোশাহেদা। মোরাকাবা কাবায় মৃত্যু বরণ করা। এখন কথা হলো কাবা দুই প্রকার, জাহেরী কাবা মক্কায় অবস্থিত আর বাতেনি কাবা হলো গুরু বা মোর্শেদ। মওলা আলী (আঃ) বলেছেন, "আমি ঐ আল্লাহ্‌র এবাদত করি না, যাকে আমি দেখি না"। রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলেছেন, "মওতা কাবলা আনতা মুতু" অর্থ তোমরা মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া যাও। উক্ত বাণীর আলোকে আপন মোর্শেদের মধ্যে ফানা বা বিকশিত হওয়াই হলো মোরাকাবা আর এমন অবস্থায় সামনে দৃশ্যায়ন কিছু যা উপস্থাপিত হয় তাই দেখা হলো মোশাহেদা। অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুকে সামনে উপস্থাপন প্রক্রিয়া হলো মোশাহেদা।

কোরানুল মাজিদের সূরা আল-ইমরানের ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন:- "বলুন (হে মোহাম্মদ) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসিতে চাও, সুতরাং আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং (তিঁনি) তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্‌ অত্যান্ত ক্ষমাশীল (এবং) পরম দয়ালু"।

একই সঙ্গে সূরা আল-ইমরানের "১৯০" নাম্বার আয়াতে উল্লেখ:- "নিশ্চয় আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি এবং দিনের পরিবর্তন অবশ্যই উলীল আলবাবদের (বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের) জন্য আয়াত (নিদর্শন) রহিয়াছে"। সূরা সাবা, ৪৬ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে:- "(হে নবী) তুমি বলো, আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই উপদেশ দিচ্ছি তা হলো তোমরা আল্লাহ্তাআলার জন্যই (সত্যের উপর) দাঁড়িয়ে যাও। দু-দু'জন করে (দু'জন না হলে) একা একা, অতঃপর ভাল করে চিন্তা কর"।

তাহলে সূরা আল-ইমরানের ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক উল্লেখ করলেন, আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাইলে মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) এর আনুগত্য করতে হবে, তবেই সেই আনুগত্য'র মূল্যায়ন হিসাবে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসবে। তাহলে রাসুল (সাঃ) (আঃ) ১৫ বছর হেরা পর্বতের গুহায় মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত ছিলেন বাংলায় ইহাকে ধ্যান বলে। এটাই উম্মতের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেলেন, তাঁর এমন আমল দরকার ছিল না। কারণ হাদিস শরীফে আসছে, "আদম যখন কাদা ও পানিতে মোশানো তখনও আমি নবী"। আলোচ্য আয়াতে গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিবেন তিঁনি অত্যান্ত পরম দয়ালু। একই সঙ্গে উক্ত সূরার ১৯০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক উল্লেখ রাখলেন :- "নিশ্চয় আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি এবং দিনের পরিবর্তন অবশ্যই উলীল আলবাবদের (বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের) জন্য আয়াত (নিদর্শন) রহিয়াছে"। তাহলে উলিল আলবাব বা বিচক্ষণ ব্যক্তির যোগ্যতায় সমাসীন হওয়ার যে প্রক্রিয়া তা হলো এই মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমের মানুষ বিচক্ষণ ব্যক্তিতে পরিনত হয়। সূরা সাবার ৪৬ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে একটি উপদেশ তা হলো সত্যের উপর দন্ডায়মান হবার নির্দেশ দিচ্ছে কোরান, সেটা আবার দু-দু'জন করে তা না হলে একা একা এবং সঙ্গে চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে তাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবার খেতাব জগতের সর্বশ্রেষ্ট নবী সরকারে দো আলম ইমামে কেবলা তাঈনে সরদারে হাসমি রহ্মাতুল্লিল আলামিন সাইয়্যেদুল কাউনাইন শফিউল মুজনাবিন ইমামুল মুরসালিন হাবিবুল্লাহ্ হুজুর আবুল কাশেম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্ব প্রথম অর্জন করলেন "আল-আমিন" খেতাব সবার কাছে গ্রহনীয় ইহাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধারা।

অতঃপর ভাল করে চিন্তা কর, এই চিন্তা হলো থিসিস বা গবেষণার একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট হবার বা নিমগ্ন হওয়ার চিন্তারই উল্লেখ। মুর্শিদ রূপের ধ্যানে পূর্ণতা পেলে আধ্যাত্মিক ভাবে রাসুলের সংযোগ হয়। তখন সাধক রাসুলের সুরত ধরিয়া ফানাফির রাসুল হাসিল করেন। যা কলেমার বিভাজনে উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ:- মোরাকাবা দ্বারা আশেক যখন খুব উপরে (উচু স্তরে) আরোহণ করে তখন পীরের সুরত ইলমে লাদুনী অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের খবর পেতে থাকেন, এমন পর্যায়ে পীরের মাধ্যম ব্যতীত কিছুই গ্রহনীয় নয়। আফতাবে এলাহী আবুল হোসেন খেরকানী (রহঃ) বলেন, "এবাদত যখন তোমার (মাশুকের) উদয় হয় তখন আমি থাকি না আর আমার উদয় হলে তুমি থাক না"। তিনি আরও বলেন, "এবাদতে হয় তুমি থাক, না হয় আমি থাকি দুই যেন না হয়"।

রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলেন:- যদি আয়নায় মানুষের চেহারা দেখা না গিয়ে চরিত্র দেখা যেত তাহলে মানুষ তার চেহার সুন্দর না করে চরিত্র সুন্দর করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকত। কোরানুল মাজিদের সূরা ইউনুসের ৪৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেন:-"যাহারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না"। আল্লাহ্কে দর্শন করতে তিঁনি স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী কর্ম বা সাধনা করতে বলেছেন সূরা ইনশিয়াকের ৬ নাম্বার আয়াতে :- "হে মানুষ তুমি তোমার প্রভুর নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত মেহনত কর, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলেন:- "আল্লাহ্র ধ্যান তথা মোরাকাবা-মোশাহেদায় নিমগ্ন একটি মুহূর্ত ৭০ বছর এবাদত বন্দেগী থেকে উত্তম" (সিররুল আসরার পৃঃ ১৭)। অপর একটি হাদিসে আসছে:- "আল্লাহ্র জাতের ধ্যানের একটি মুহূর্তের মর্যাদা হাজার বছর এবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ" (বোখারী-৬৯৭০, মুসলিম-২৬৭৫)।

হযরত হামীদুদ্দীন নাগরী (রহঃ) তার "নাহাক্কাতুল" গ্রন্থে লিখেছেন:- কেবলা ৪ (চার) প্রকার।

১) মক্কায় অবস্থিত সকল মুসলমান নামজ আদায় করে।

২) মমিনের নিজের কলব বা দিল যার দিকে তরিকত অবলম্বীদের লক্ষ্য।

৩) কেবলা মুর্শিদ যার দিকে মুরিদের সকল এরাদা থাকা উচিৎ।

৪) কেবলা ওয়াজহুল্লাহ্ যা সকল কেবলা বিলীনকার।

বাবা হযরত নিজামউদ্দীন আওলিয়ার ভক্ত প্রেমের কবি বাবা আমির খসরু (আঃ) গেয়েছেন:- "যখন প্রনয়নীর রূপ ব্যতীত অন্য কেবলা ছিল না, তখন প্রেম এসে অন্য সকল কেবলাকে বিলীন করে ফেলল। কথিত আছে, একবার নিজামউদ্দীন আওলিয়া দরবারে উপবিষ্ট তাঁর মাথার টুপি তেরছি ভাবে একদিকে হেলানো তা আমীর খসরুর (আঃ) চোখে বড় সুন্দর লাগল। তিঁনি বলে উঠলেন, সকল জাতির জন্য এক-একটি পৃথক পন্থী ধর্ম ও দিক (কেবলা) নির্দিষ্ট আছে। আমি আমার কেবলা তেরছি টুপির দিকে নির্ধারণ করলাম।

কথিত আছে যে, একবার কোন এক অপরাধে শেখ আজল তাবরেজীকে কতল করার জন্য জল্লাদের হাতে অর্পণ করা হয়। জল্লাদ তাকে কতলের স্থানে নিয়ে কেবলামুখী করিয়া দাঁড় করায়। তখন শেখ আজল তাবরেজী দেখল তাঁর পীরের মাজার তাঁর পিছনে পড়ে। তিঁনি কেবলার দিক হতে ঘুরে মুর্শিদের মাজারের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। জল্লাদ তাঁকে বলল, তুমি এখন যে অবস্থায় পতিত তোমার কেবলার দিকে মুখ করা কর্তব্য। জবাবে তিঁনি বললেন, তোমার তা দিয়ে কি কাজ। তুমি তরবারি উত্তোলন কর এবং আমার ঘাড়ের উপর মারো, আমি আমার নিজ কেবলার দিকেই তাকিয়ে আছি। এ বিষয় নিয়ে জল্লাদের মধ্যে তাঁর তর্ক বেঁধে গেল। এ তর্ক থাকতে থাকতে শাহী ফরমান এলো, ফরমানে উল্লেখ দরবেশকে ক্ষমা করা হলো, তাঁকে মুক্তি করে দাও। ফাওয়ায়েদুস সালেকীন কেতাবে লিখিত আছে হযরত বখতিয়ার কাকী (রহঃ) যখন এই ঘটনা বিবৃতি করছিলেন। তখন তিনি অশ্রুপূর্ণ চোখে বললেন, সেই ফকিরের এই প্রকার নেক আকিদা তাঁকে কতল হতে মুক্ত করেছিল।

হযরত আদম (আঃ) কে আল্লাহ্ তিনটি ইবাদত শিখিয়েছিলেন:- "জিকির, মোরাকাবা, মোশাহেদা। এই তিনটি ইবাদতই ছিল তাঁর নামাজ। হযরত আদম (আঃ) সালেহা, সালেহা, সালেহা বলে জিকির করতেন" (তথ্যসূত্র: ইটিভি ২ মে, ২০১৮ [২৩:১৯])। এছাড়া হযরত আদম (আঃ) গর্দান ঝুঁকিয়ে মোরাকাবায় বসে থাকতেন, ধ্যানে নিমগ্ন হতেন। তাছাড়া হযরত আদম (আঃ) তৃতীয় সাধনা ছিল মোশাহেবা। রাতের গভীরে একাকী নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে নিজের বিচার করাই হলো মোশাহেবা।

তিরমিজি শরীফের একটি হাদিসে উল্লেখ হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) বলেনঃ- "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুর পূর্বে নিজের বিচার করে নেয়"। রাসুল (সাঃ) (আঃ) বলেনঃ- "তোমরা যখন আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে তখন হয় ভাববে তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছ, না হয় ভাববে আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন।

মোরাকাবা-মোশাহেদা বুঝবার জন্য উল্লেখিত সনদ গুলো তুলে ধরা হলো। এই আমল নীতির দ্বারা মানুষ স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌঁছায়। মহানবী (সাঃ) (আঃ) তাঁর হায়াতের জিন্দিগিতে ১৫ বছর (জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সময়) হেরা পর্বতের গুহায় কাটালেন। তাঁরই উম্মত আমরা স্বীয় ধর্মের চলমান মানদন্ডে এই মোরাকাবা-মোশাহেদার (জাহিরি ভাবে) স্থান হলো না। প্রচলিত ব্যবস্থায় ধর্মে এই আমল নীতির কোন তাগিদ পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে ধর্মের বিতর্কের অবসান গুলি কি দিয়ে নিঃষ্পত্তি হবে ? মূল ধারার বিধান কোন ধারাতে প্রতিষ্ঠিত হবে! তাই জ্ঞানীদেরকে চিন্তিত করে। এহেন অবস্থা উত্তরণের জন্য সুফিরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক এই আমল নীতির সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে থাকে। তাই মানুষ মুক্তির ধারাতে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে একটি পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত হতে হলে অবশ্যই তাকে মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত হতে হবে। আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্ কর্তৃক সকল প্রতিনিধিগণের আমল নীতি ছিল এই মোরাকাবা-মোশাহেদা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচাইতে বেশী জরুরী হলো "গুরুবাদ" ব্যবস্থা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো, আপন মোর্শেদের ভিতর ফানা বা বিকশিত হবার ধারা থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ের বা আমল নীতির কার্যকারিতা মেলে। জ্ঞানীগণের উক্তি, "মোর্শেদ হলো রাসুল (সাঃ) (আঃ) দেখার আয়না, আর রাসুল (সাঃ) (আঃ) হলো আল্লাহ্ দেখার আয়না"। এজন্য মূল কথা দাঁড়ায় মোর্শিদ হলো সূচনা বা সিঁড়ি। মোর্শেদ ছাড়া এসকল বিষয় কিছুই সম্ভবপর নয়। ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত আশেক যার ইহকাল ও পরকালের সকল আশা পরিত্যাগ করে মাশুকের দিকে নিবদ্ধ রয়েছে। আবার বলা হয়েছে, সত্যিকারের আশেক সেই ব্যক্তি যিনি মাশুকের দেওয়া সকল দুঃখ-কষ্ট ও মসিবতকে আনন্দের সাথে গ্রহন করেন এবং উহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন না।

কথা কম, খাওয়া কম, ঘুমানো কম মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের অবশ্যই পালনীয় কাজ।

এ প্রসঙ্গে কোরানুল মাজিদের সূরা আনফাল আয়াত নং ২৮ উল্লেখ :- "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অকাল্যাণের সম্মুখীন কারী, বস্তুত আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা কল্যাণ"।

আলোচ্য মোরাকাবা-মোশাহেদা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সার সংক্ষেপে দিয়ে শেষ করব। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার এল. জন বেয়ার্ড সংক্ষেপে লে. জি. বেয়ার্ড বলা হয়। তিনি টেলিভিশন আবিষ্কার করেন তার এই আবিষ্কারের কার্য-করণ তিনি উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, প্রথম আমি একটি মানব দেহ নিয়ে গবেষণা শুরু করি যার নাম দিয়েছি ম্যান্টাল বডি (মানব দেহ)। দীর্ঘকাল গবেষণার পর এটা রূপান্তর হয়ে গেল, রূপান্তরিত যে দেহ সেটাকে নাম দেওয়া হলো অষ্ট্রাল বডি (জ্বতির দেহ)। এটা নিয়ে কৌতুহল সৃষ্টি হলো আমার মধ্যে, তাই আমি এটা নিয়ে আরো গভীর ভাবে গবেষণায় লিপ্ত হই। পরবর্তীতে এটা আবার রূপান্তর হলো, যার নাম দিলাম অকেশনাল বডি (নিমিত্ব দেহ)। এই নিমিত্ব দেহ হতেই আমার এই আবিষ্কার (সংক্ষিপ্ত)।

এখানে বুঝবার বিষয় হলো, সাধক যখন আপন মোর্শেদের ধ্যান বা মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত থাকেন তখন পরিবর্তিত রূপ হতে হতে পর্যায় ক্রমে তা মূলের ধারাকে উদ্ভাসন এবং মিলন প্রক্রিয়াতে পৌঁছে দেয়। এজন্য আধ্যাত্মিক প্রদীপ্ত আকারে তা সাধকের মাঝে প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ঘটায়। এই প্রদীপ্ত অবস্থাটাই হলো মোরাকাবা-মোশাহেদার পরিপূর্ণতার প্রাপ্তি। সাধনা বা মোরাকাবা-মোশাহেদা সম্পর্কে আরও ভাল করে বুঝতে আমার মোর্শেদ কেবলা-কাবা ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরীর "সুফিবাদ আত্ম পরিচয়ের একমাত্র পথ (১ম খন্ড)" কিতাবখানা পড়তে পাঠক বাবা-মায়েদেরকে অনুরোধ রাখি। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে ফরিয়াদ' সবাইকে যেন মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে অবগত করবার তৌফিক দান করেন। আমিন।

বাণী চিরন্তনী

★ **“বিচার দিনে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশি অনুতপ্ত হবে, যে অন্যায় পথ অবলম্বন করে সম্পদ উপার্জন করেছে। সম্পদের উত্তরাধিকারী যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করে- তবে সে (উত্তরাধিকারী) বেহেস্তবাসী হবে। কিন্তু প্রথম উপার্জনকারী তার অপরাধের জন্য দোযখবাসী হবে”।**

মওলা আলী (আঃ)

★ **“এমন অনেক কথা আছে যা আক্রমণ থেকেও বেশি কার্যকর”।**

মওলা আলী (আঃ)

★ **“যাতে তৃপ্তি পাওয়া যায় তা ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট”।**

মওলা আলী (আঃ)

★ **“পাপে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ না থাকা এক প্রকার সততা”।**

মওলা আলী (আঃ)

★ **“হৃদয় হলো চোখের গ্রন্থ”।**

মওলা আলী (আঃ)

★ **“বন্ধুকে একটা সীমা অবধি ভালবাসো, কারণ সে যে কোন সময় শত্রু হয়ে যেতে পারে। আবার শত্রুকে একটা সীমা অবধি ঘৃণা কর, কারণ সে যে কোন সময় তোমার বন্ধ হয়ে যেতে পারে”।**

মওলা আলী (আঃ)

★ **“সবকিছু বিচার করে বলা যায় নারী মন্দ, কিন্তু এর নিকৃষ্টতম অবস্থা হলো কেউ তাকে ছাড়া চলতে পারে না”।**

মওলা আলী (আঃ)

★ **“সম্ভব্যতার উপর নির্ভর করে রায় দিলে তাতে ন্যায় বিচার হয় না”।**

মওলা আলী (আঃ)

★ **“ইসলামে রোহবানিয়াত নাই”- হাদিসের এই কথাটির ভুল অর্থ করা হইয়া থাকে। যথা ইসালামে বৈরাগ্য নাই অথচ ইসলাম হইল বৈরাগ্যের ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। লিখিত কোরানের প্রতিটি পাতা পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাব বহন করিতেছে। গৃহ ছাড়িলেই বৈরাগ্য হয় না, আমিত্ব ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকৃত বৈরাগ্য”।**

শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ)

★ **“অমাই ইউকা সুহ্হান নাফসিহি ফাউলাইকা হুমুল মুফলেহুন (আল-কোরান)। অর্থাৎ “এবং যে ব্যক্তি তাহার নফ্সকে লোভ মুক্ত করিয়াছে” পূর্ণ বৈরাগ্যই ইসলামের ব্যবস্থা”।**

শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতী (আঃ)

★ **“যখন সবাই কিছু একটা হতে চাইছে, তখন তুমি বরং কিছু হতে যেও না। শূন্যতার সীমানায় নিজেকে মেলে দাও। মানুষের উচিৎ একটা পাত্রের মতন হওয়া। একটি পাত্রের মধ্যকার শূন্যতা যেমন তাকে ধরে রাখে, তেমনি একজন মানুষকে ধরে থাকে তার নিজের কিছুই না হয়ে থাকার সচেতনতা”।**

বাবা শামসেত্তাব্রীজ (আঃ)

★ **“তুমি কি ভবিষৎ এর দিকে চেয়ে আছো জান্নাত/জাহান্নাম দেখতে ? অথচ তোমার বর্তমানের মাঝেই রয়েছে সেগুলো। যখন তুমি কোন চুক্তি, যুক্তি আর প্রত্যাশা ছাড়াই ভালবাসতে পারবে, তখন তুমি জান্নাত খুঁজে পাবে। যখন তুমি ঘৃণা আর মারামারিতে জড়িয়ে থাকবে, তুমি খুঁজে পাবে জাহান্নাম”।**

বাবা শামসেত্তাব্রীজ (আঃ)

★ **“আপন পবিত্র নফ্সের সঙ্গে অপবিত্র খান্নাসটিকে পরীক্ষা করার জন্য যে দেওয়া হয়েছে উহাকে তথা খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দাও অথবা মুসলমান বানিয়ে দাও। ইহাই ইসলামের মূল দর্শন”। “দ্রুত সাফল্য ভাগ্যের ব্যাপার, যারা সফল হয় তাদের ভুল থাকে। কিন্তু যারা ভুলে কারণে থেমে যায় না এভাবেই ধীরে ধীরে পূর্ণতা পায়”।**

চেরাগে জান শরীফ কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরী

★ **“সুফিবাদের উপর যখন খনকারি, কবিরাজি, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-তুম্বা, জ্বিন তাড়ানোর ভড়ং-চড়ং, মাটি বাবা, জুতা বাবা, গাছ বাবা, পানি বাবা, ইত্যাদি বিষয়গুলো আরোপিত হয় তখন সুফিবাদও কলুষিত হয়ে যায়, কলঙ্কিত হয়ে যায়, দূষিত হয়ে যায়, পাপপূর্ণ হয়ে যায়”।**

চেরাগে জান শরীফ কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরী

★ **“মানুষ ছোট হতে কবরে যাবার আগে পর্যন্ত আসল বিষয় ফেলে গল্প শুনতে বড়ই ভালবাসে এবং ইহাকেও একটি সুন্দর তকদির বলতে চাই”।**

চেরাগে জান শরীফ কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরী

★ **“মৃত্যু নামক কেয়ামতে সগিরা ঘটে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে একটি মানুষকে তার আপন পরিচয় এবং স্বরূপটি দেখিয়ে দেওয়া হয় তথা পূর্বজন্মের কর্মফলটি ভোগ করতে হবে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়” ।**

চেরাগে জান শরীফ কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরী

★ **“খান্নাসমুক্ত জীবন এই সংঘাতযুক্ত দুনিয়ার মাঝেও আপন ভাবের মধ্যে ডুবে থেকে আপন জান্নাত নামক বাগান বা উদ্যানে অবস্থান করে”।**

চেরাগে জান শরীফ কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরী

★ **“সন্তানের সাফল্য চাইলে তাকে মাছ খেতে দেওয়ার বদলে মাছ ধরতে শেখাও”।**

মাও সেতুং

★ **“অন্যের বিজয় বা পূর্ণতা দেখে ছুটাছুটি ছেড়ে তার ভুল থেকে শিখতে চেষ্টা কর, ব্যর্থতা কমবে”।**

★ **“অসত্যের পথে সফল হবার চেয়ে সত্যের পথে ব্যর্থ হওয়া অনেক ভাল”।**

হারমান মেলভি

★ **“যদি তোমার সমালোচনা করার মত কেউ না থাকে, তবে তোমার সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে”।**

ম্যালকম এক্স

★ **“ব্যর্থতার ছাই থেকে সাফল্যের প্রাসাদ গড়ো, হতাশা আর ব্যর্থতা হলো সাফল্যের প্রাসাদের দুই মূল ভিত্তি”।**

ডেল কার্নেগী

★ **“সাফল্যের মূল হলো হাতের কাজের প্রতি ভালবাসা আর কঠোর পরিশ্রম, সেই সাথে জয় পরাজয় ভুলে নিজের পুরো সমর্থন বিলিয়ে দেওয়া”।**

ভিন্স লম্বারডি

★ **“জীবনে সফল হতে চাইলে দু’টি জিনিস প্রয়োজন :- জিদ আর আত্মবিশ্বাস”।**

মার্ক টোয়েন

★ **“একটি লক্ষ্য ঠিক কর আর সেই লক্ষ্যকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে ফেলো - চিন্তা কর, স্বপ্ন দেখো। তোমার মস্তিষ্ক, পেশী, রক্তনালী পুরো শরীরে সেই লক্ষ্যকে ছড়িয়ে দাও আর বাকি সবকিছুকে ভুলে যাও। এটাই সাফল্যের পথ”।**

স্বামী বিবেকানন্দ

★ **“ভালবাসা, শ্রম সাধনা, এবং স্বপ্ন (মূল লক্ষ্য) - ব্যর্থতার পরেও কাজ করে যেতে হবে তবেই সাফল্য”।**

শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া গুরু বাদের একমাত্র কাজ

ইঞ্জিঃ বাবা দেলোয়ার হোসেন বা-গোলামে জাহাঙ্গীর আল্ সুরেশ্বরী।

বি:দ্রঃ বিবৃতিতে সংকলিত কোন তথ্য পাওয়া গেলে তা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার সবিনয় অনুরোধ রইল।

মুদ্রণ জনিত ত্রুটির জন্য মার্জনা প্রত্যাশা রইল।

বইটি পাঠকদের হাতে তুলে ধরতে যারা সহযোগীতা করেছেন :-

(১) শাহ সুফি মজিদ আলী আল-সুরেশ্বরী - মনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।

(২) শাহ সুফি রফিক আল-সুরেশ্বরী - আতাইকুলা, পাবনা।

(৩) শাহ সুফি শরীফ আল-সুরেশ্বরী - মনিবপুর, দোগছী, পাবনা।

(৪) মোছাঃ নাজমা খাতুন - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।

(৫) মোঃ তুষার বিশ্বাস - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

(৬) মোঃ সুলতান মাহমুদ - শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

(৭) মোঃ রাজা - চরদুলকদিয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।

(৮) মোঃ শাহ আলম - পাবনা।

(৯) জনাব মোঃ রেজাউল করিম - ঢাকা।

(১০) মোঃ আব্দুর রাজ্জাক - পাবনা।

(১১) মোঃ হান্নান শেখ - চকদুবলিয়া, দোগাছী, পাবনা।

(১২) মোঃ ওমর - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

(১৩) মোঃ মিলন - বাবুলচড়া, দোগাছ, পাবনা।

(১৪) মোঃ ফিরোজ - মনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।

(১৫) মোঃ আনিসুর রহমান (আনিস) - খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা।

(১৬) মোঃ ইবায়দুল দর্জি - চকদুবলিয়া, দোগাছী, পাবনা।

(১৭) মোঃ জাহাঙ্গীর বিশ্বাস - দোগাছী, পাবনা।

(১৮) মোঃ মান্নান - পিঁপড়ী, দোগাছী, পাবনা।

(১৯) মোঃ হোসেন আলী বিশ্বাস - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

(২০) মোঃ জুয়েল - চরবলরামপুর, দোগাছী, পাবনা।

(২১) মোঃ ওহিদুল - কায়েমকোলা, দোগছী, পাবনা।

(২২) মোঃ কুতুব বিশ্বাস - কায়েমকোলা, দোগছী, পাবনা।

(২৩) মোঃ জহুরুল ইসলাম - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

(২৪) মোঃ আনিস - মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।

(২৫) মোঃ লিপটন রহমান - খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা।

(২৬) মোঃ সুমন রহমান - খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা।

(২৭) মোঃ হাসনাত বিশ্বাস - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।

(২৮) মোঃ বাবু বিশ্বাস - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

(২৯) মোঃ শাহীন - মনিবপুর, দোগছী, পাবনা।

(৩০) মোছাঃ হাসিনা বিশ্বাস - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।

(৩১) মোছাঃ কল্পনা বিশ্বাস - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।

(৩২) মোছাঃ কণা বিশ্বাস - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।

(৩৩) মোছাঃ সাবিনা খাতুন - বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।

(৩৪) মোছাঃ সেলিনা বিশ্বাস - কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

(৩৫) মোঃ হাফেজ রবিউল ইসলাম - বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।

(৩৬) মোঃ অনিক - খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা।

(৩৭) মোঃ রানা - মনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।

(৩৮) মোঃ আব্দুস সালাম - বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।

(৩৯) মোঃ রবিউল ইসলাম - ঢাকা।

(৪০) মোছাঃ রেশমী খাতুন - কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।

(৪১) মোঃ জাহিদ বিবি - পাবনা।

(৪২) মোঃ আরাফাত শাহ - রাজশাহী।

(৪৩) মোঃ আজম - পোড়াডাঙ্গা, সুজানগর, পাবনা।

(৪৪) মোঃ শাহজাহান - কুড়িপাড়া, সুজানগর, পাবনা।

(৪৫) মোঃ মনজু - পোড়াডাঙ্গা, সুজানগর, পাবনা।

(৪৬) মোঃ রাকিব হোসেন - পোড়াডাঙ্গা, সুজানগর, পাবনা।

(৪৭) মোঃ সিরাজুল ইসলাম - পোড়াডাঙ্গা, সুজানগর, পাবনা।

(৪৮) জনাব মোঃ অহিদ জামাল - ইসলামপুর, ঢাক।

(৪৯) মোঃ রইচ উদ্দিন - পাবনা।

(৫০) মোছাঃ তানজিল খাতুন - পাবনা।

(৫১) মোছাঃ ফাতেমা খাতুন - প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,পাবনা।

(৫২) মোঃ সালাউদ্দিন - বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।

(৫৩) মোঃ বাবু মৃধা - বেড়াদুলিয়া, সুজানগর, পাবনা।

(৫৪) মোঃ সাদ্দাম মিঞা - ফুলালদুলিয়া, সুজানগর, পাবনা।

(৫৪) মোঃ বাবু শেখ - বেড়াদুলিয়া, সুজানগর, পাবনা।